সারেঙ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত



প্রকাশক
দিগন্ত পাব্‌লিশার্স লিমিটেড্‌ পক্ষে
তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়
পি-৬, মিশন রো এক্স্‌টেনশান, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪

দাম—দু' টাকা বারো আনা

মুদ্রাকর
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্‌লিশার্স লিমিটেড্‌
পক্ষে শ্রীসুবোধ কুমার পাল
৫৯-সি, বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিষ্ণু দে

প্রিয়বরেষু

আশ্বিন, ১৩৫৪

এই গল্পগুলির রচনাকাল ১৩৫২-৫৩

গ্রন্থকারের অন্যান্য সাম্প্রতিক গল্পের বই

যতন বিবি, ১৩৫১

কাঠ-খড়-কেরোসিন, ১৩৫২

কালো রক্ত, ১৩৫২

আসমান-জমিন, ১৩৫৩

চাষাভুষা, ১৩৫৪

সূচীপত্র

সারেঙ	১
যশোমতী	১৮
নতুন দিন	৩৪
নুরবানু	৪৯
অপরাধ	৬৪
লালমালা	৭৯
মাষ্টার সাহেব	৯৪
বিড়ি	১১১
সূর্যদেব	১২৬
ধান	১৩৬

সারেঙ

মা নাসিমকে মেরেছে। মা মেরেছিল মারুক, কিন্তু ও মারবে কেন? ও কে?

গরু-বাছুর রাখি না রাখি, চাষ-রোপণ করি না করি, তাতে ওর কী? জমি খিল যায় তো যাবে, তাতে ওর কী মাথা-ব্যথা! ঘরের খড় বদলানো দরকার কি না-দরকার তা আমরা দেখব। ভিজতে হলে ভিজব আমরা মায়ে-পোয়ে। ওকে ছাতি মেলতে ডাকবে না কেউ।

না, গোলবানু বলে, এবার থেকে তত্ত্বপালন করবে গহরালি।

কে গহরালি? নাসিম ঘাড় ঝাড়া দিয়ে তেড়ে ওঠে।

মস্ত লোক। জমি আছে পাঁচ কানি। কাচারি আছে দরজায়। দায়েরী মোকদ্দমা আছে ক নম্বর।

তাতে আমাদের কী?

ওকে ধরলে জমি-জায়গা ঠিক থাকবে, খাওন-পিরনের কষ্ট থাকবে না, খড়-কুটার বদলে ঢেউ-টিনের ঘর উঠবে এক দিন।

চাই না। আমাদের এই ভাঙা ঘরই ভালো। আমরা শাক-লতা খেয়ে থাকব। তুই ওকে তাড়িয়ে দে।

শক্ত মার দিলে গহরালি। সঙ্গে-সঙ্গে গোলবানুও হাত মেলাল।

বাপজান বেঁচে থাকলে এমন কেউ মারতে পারত না তাকে। মাঠে যাবার জন্যে তাকে ঠেলাঠেলি করত না। সে জাল নিয়ে বিলে-বাওড়ে বেরিয়ে পড়ত মাছ ধরতে। বাপজান বলত, হাটে তোকে কাটা-কাপড়ের দোকান করে দেব একখানা। তার চেয়ে আমাকে একটা নৌকো কিনে দাও। বলত নাসিম। মাটির চেয়ে দরিয়ার পানি আমার বেশি ভাল লাগে।

বাজানের নৌকো কিনে দেবার সাধ্য ছিল না। নাসিম এখনো এত বড় হয়নি যে কেরায়া নৌকো বেয়ে খেটে খাবে। তার জাল কবে ছিঁড়ে গেছে। তবু জালের টান সে ভুলতে পারে না। নদীর ধারে চুপটি করে বসে থাকে। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে চোখের জল।

সে শুনেছে, মা নিকা বসবে গহরালির কাছে। এক ঘরের মানুষ হয়ে থাকবে তারা। নাসিমের আর জায়গা কোথায়? হাতনেয়, প্যাছ-দুয়ারে। লোকে যখন মাকে জিগ্‌গেস করবে, এ কে, তখন মা বলবে, আমার আগের পুরুষের সন্তান। কার ভাতে আছিস? যখন কেউ জিগগেস করবে নাসিমকে, সে বলবে, গহরালির ভাতে। বুকের ভিতরটা জ্বলতে থাকে নাসিমের।

মাইল-খানেক দূরে ব্র্যাঞ্চ লাইনের ইষ্টিমার থামে। পাট-ক্ষেতের পাশে। জেটি বা ফ্ল্যাট নেই, বাদাম গাছের গুঁড়ির সঙ্গে কাছি জড়িয়ে ইষ্টিমার পাড় ঘেঁসে দাঁড়ায়, আশ্চর্য রকম গা বাঁচিয়ে। সটান পাড়ের উপরেই সিঁড়ি পড়ে দু'খানা। সিঁড়ির এ-ধার থেকে ও-ধারে বাঁশের লগি ধরে দাঁড়ায় দুজন খালাসী। নামা-ওঠা করে যাত্রীরা। বাদাম গাছের তলায় বসে ছোট একটি টিনের বাক্সতে করে টিকিট বেচে ঘাট-সরকার। যারা নামে তাদের থেকে টিকিট কুড়োয়, ফাঁকি দিয়ে যে

আসতে পেরেছে তার সঙ্গে এক ফাঁকে কথাটা সেরে রাখে। তারপর উঠে আসে ইষ্টিমারে, হিসাব-কিতাব করতে, জাহাজের বাবুর সঙ্গে। ঘাট-সরকার নেমে না যাওয়া পর্যন্ত সিঁড়ি তোলে না। একখানা তুললেও আরেকখানা রেখে দেয়। লগি লাগে না ঘাট-সরকারের।

ডোবা দেশ, প্রায় সময়েই জল থাকে দাঁড়িয়ে। গাছের গোড়াটাই যা একটু ট্যাকা-মতন। যাত্রীরা জল ভেঙে গিয়ে গাঁয়ের রাস্তা ধরে। হাতে-ঠেলা ডোঙা আছে একখানা। মালামাল থাকলে তার শরণ নেয়। বাচ্ছা-কাচ্ছারা কাঁধে-কাঁখে করে পার হয়। ছুটুলে বউ হলে পাঁজা-কোলে করে।

'সিঁড়ি তোল্।' দোতলার থেকে সারেঙ হুকুম দেয়।

ঘাট-সরকার এখনো নামেনি বুঝি ? না, এই নেমে গেল আঁকা-বাঁকা পায়ে। তুলে নিল শেষ সিঁড়িটা। হড়-হড়-হড়-হড় করে মোটা শিকলে বাঁধা নোঙর উঠে আসতে লাগল।

একটা লোক তাড়াতাড়িতে নামতে পারেনি বুঝি। লোক কোথায়, দশ-বারো বছরের ছেলে একটা। প্যাসেঞ্জার না কি ? কে জানে ? জাহাজ দেখতে উঠে এসেছিল হয়তো দুষ্টুমি করে। তবে নেমে যেতে বল পরের ঘাটে, পাতাকাটায়। শেষ-বেলার ভাটিতে তরতরিয়ে বেয়ে যেতে পারবে একমাল্লার নৌকোয়। আন্ধার হয়ে যাবে, তড়ে যাবে কি করে ! আহা ! বাপ-মা কত ভাববে না জানি।

ছোট ইষ্টিমার, উপরের ঢালা ডেকে শুধু থার্ড ক্লাশ। সামনের দিকে ফাষ্ট ক্লাশের দুটো পায়রার খোপ, আর তারই সামনের খোলা কোণাচে জায়গাটুকুতে সারেঙের হুইল। নাসিম একেবারে সেখানে এসে হাজির হল।

প্রথমটা কেউ দেখেও দেখেনি। ভেবেছে কলের কায়দা দেখবার জন্যে এমনি উঠে এসেছে বুঝি। কিন্তু, না, নড়ে না ছেলেটা।

'কি চাই ?' চটি পায়ে, কিস্তি টুপি মাথায়, সারেঙ হুঁকো ফুঁকছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঘাড় বেঁকিয়ে জিগগেস করলে।

'হুজুরের যদি চাকরের দরকার থাকে আমাকে রাখতে পারেন।'

'তোর দেশ কই ?' সারেঙ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল নাসিমের মুখের দিকে।

'এইখানেই হুজুর, কনকদিয়া।'

'মা-বাপ আছে ?'

'কেউ নাই।'

আবার কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল সারেঙ। বললে, 'কাজ করতে পারবি তুই ?'

'কি-কি কাজ হুজুর ?'

'রাঁধা-বাড়া, ধোয়া-মোছা, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা—এই সব আর কি। পারবি ? বেশ, লেগে যা তা হলে। মুফৎ একটা ছোকরা যদি পাওয়া যায় তো মন্দ কি।' হুইলের লোক ইয়াদালির সঙ্গে একবার চোখ-তাকাতাকি করে: 'অন্তত হুঁকোটা তো সাজতে পারবে, গা-হাত-পা টিপে দিতে পারবে তো দরকার হলে।'

ইয়াদালি বললে, 'মাইনে পাবে না কিছু ?'

'মাইনে না হাতি!' সারেঙ ঝামটা দিয়ে উঠল: 'সোতের শ্যাওলা দিয়ে তরকারি রান্না করে খেতে হবে ? বয়ে গেছে আমার! অমনি থাকতে চায় তো থাকবে, নইলে নামিয়ে দেব জোর করে। কি, টিকিট আছে ?'

'না, হুজুর, মাইনে চাই না আমি।'

জাহাজে যে জায়গা পেয়েছে এই নাসিমের বেশি। বাপ নয়, চাচা নয়, মুনিব নয়, মালেক নয়, উটকো বাজে লোকের যে মার খেতে হবে না মুখ বুজে, এই তার অনেক। অজানার টানে যে ভাসতে পেরেছে অকূলে এই তার মহা সুখ।

'ভালো করে কাজ-কর্ম্ম করতে পারলে জাহাজেই বাহাল করব এক সময়। প্রথমেই সিঁড়ি, পরে পাটাতন, ক্রমে-ক্রমে শুখানি, শেষে একেবারে সারেঙ। কে বলতে পারে? আগে বিনি-মাইনের চাকর, শেষকালে এই জাহাজের জমিদার।' সারেঙ তার শাদা শীর্ণ দাড়িতে হাত বুলুতে লাগল।

কিন্তু প্রথম দিনই রাত্রে নাসিম মার খেল সারেঙের হাতে। বেখেয়ালে ভেঙে ফেলেছিল একখানা কাচের বাসন। আর যায় কোথা! বলা-কওয়া নেই, মুখে-মাথায় ঘাড়ে-পিঠে পড়তে লাগল চাঁটির পর চাঁটি। ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল নাসিম। বেশি গোলমাল করবে তো হাত-পা বেঁধে ফেলে দেবে কালো জলে।

ব্যথার চেয়ে আশ্চর্য লাগল বেশি নাসিমের। কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছুই নেই এতে। এই এখানকার রেওয়াজ। সবাইকেই মার খেতে হয় সারেঙের হাতে। যারা সিঁড়ি দেয়, যারা পাটাতন ধোয়, যারা আছে লঙ্গরের কাজে, দড়িকাছির কাজে, যারা বা লাইট ঘোরায়, তাদের কাজের এতটুকু গলতি বা গাফিলতি হলেই সুরু হয় মারধোর। নিচে মেস্তরির এলাকা। তাকে ঘিরে কাজ করে কয়লাওয়ালা, আগুনওয়ালা, ইঞ্জিনওয়ালা। কিন্তু চরম শাসনের ভার সারেঙের হেপাজতে। ভুল করেছে কেউ, এক কল ঘোরাতে আরেক কল ঘুরিয়ে দিয়েছে, এক

ডাণ্ডা টানতে আরেক ডাণ্ডা টেনেছে, তা হলে আর রক্ষে নেই। লাথি-চড়, জাত-বেজাতের গালাগালি, জুত'-পিট্টি পর্যন্ত! তাতেও না শানায় চাকরি থেকে বরখাস্ত।

কেনই বা হবে না শুনি? কোম্পানি শুধু সারেঙকে চেনে, সারেঙকে বোঝে। জাহাজের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সে। সমস্ত দায়িত্ব তার। চলতি-পথে ইষ্টিমার যদি নৌকো ডুবিয়ে ফেলে, খেসারৎ দিতে হবে সারেঙ সাহেবকে। দুর্যোগে পড়ে খোদ ইষ্টিমার যদি ডুবে যায়, দায়ী কে? কোম্পানির সাহেবরা নয়। যত কিছু মালি-মোকদ্দমা চলতি-পথের ইষ্টিমার নিয়ে, সমস্ত ফলাফল সারেঙ সাহেবের। আর যদি ঝড়-তুফান থেকে ইষ্টিমার পাড়ে ভিড়ানো যায় তার পুরস্কারও এই সারেঙ সাহেবেরই প্রাপ্য। মেস্তুরি-খালাসিরা যতই হাঁক-ডাক দৌড়-ঝাঁপ করুক, যতই কায়দা-কেরামতি দেখাক, টাকার তোড়ার এক-আধটু ছিটেফোঁটাও কারু বরাতে জুটবে না। যত মেডেল সব সারেঙ সাহেবের গলায় ঝোলানো।

'কী হল হঠাৎ?'

ইষ্টিমার চরে ঠেকেছে। চোরা চর, কুয়াশায় ঠাহর হয়নি। চাকা বসে গেছে মাটির মধ্যে, শিগগির যে ছাড়ান পাবে এমন মনে হয় না। খবর পাঠাতে হবে বন্দরের ডকে, জালি-বোটে করে লোক পাঠাতে হবে কাছের যে ইষ্টিশানে টরে-টক্কা আছে। সেও এমন কিছু ধারাধারি নয়। বেশির ভাগ ইষ্টিশানই তো গাছতলা বা ক্ষেত-খোলা। কম-সে-কম সাত-আট ঘণ্টা লেট আজ নিঘ্‌ঘাত। মধ্যিখানে যত ঘাটে যাত্রীরা ইষ্টিমারের আশায় বসে আছে তারা সমস্ত রাত আজ দূরে ধোঁয়া দেখবে আর হুইসল শুনবে।

দোষ কার?

দোষ শুখানির, দোষ সেকেণ্ড মেটের। লম্বা-চওড়া জোয়ান মরদ সব, এখন আর মারতে আরাম লাগে না, নিজেরই হাতে-পায়ে চোট লাগে। কিন্তু যাবে কোথায়? এই মাসের পুরো মাইনে বরবাদ হয়ে যাবে এদের। খোরাক কিনতে হবে নিজের পয়সায়।

সারেঙ যেন এই জাহাজের ইজারাদার। মোকররি ইজারা। যত খরচ সরঞ্জাম বাবদ, মেরামত বাবদ, খালাসী-মেস্তরির মাইনে বাবদ—হিসেব করে একটা মোটা টাকা সারেঙের হাতে ধরে দেয় কোম্পানি। সমস্ত বিলি-ব্যবস্থা করার মলিক এই সারেঙ। যাকে খুশি পুরো মাইনে দেয়, যাকে খুশি জরিমানা করে। যাকে খুশি খোরাক কাটে, যাকে খুশি জবাব দেয়। এর বিরুদ্ধে নালিশ নেই, সালিশ-ফয়সালা নেই। ভিতরের শাসন নিয়ে কোম্পানি মাথা ঘামায় না, সে দেখে, ঘাট থেকে ঘাটে মালে-মানুষে বোঝাই হয়ে ইষ্টিমার মোটা মুনাফার মাশুল আনতে পারে কি না।

সমস্ত ইষ্টিমার তাই সারেঙের কথায় ওঠে-বসে। সব কর্ম্মচারী তার তাঁবেদার। ইষ্টিমার তো নয়, যেন সে লাটদারি পেয়েছে।

'কেঁদে কিছু লাভ হবে না।' পাশ থেকে বললে মকবুল। 'এমনি অনেক মার খেতে হবে। মার খেতে-খেতে তবে প্রমোশন।'

মকবুলও প্রথম ঢোকে চাকর হয়ে। পাকের কাজের নয়, সারেঙের ধোপা-মুচির কাজে। তিন বছর পর সে সিঁড়ি পেয়েছে। সিঁড়ির পরে পাবে পাটাতন, তার পরেই দড়ি-কাছি। মার না খেলে উন্নতি নেই জাহাজে।

'সাহেবের সুদৃষ্টি না হলে কিছুই হবার নেই। দশ-বারো বছর

পর সাহেবের যদি দয়া হয়, সার্টিফিকট দেবে। পরে সেই সার্টি-ফিকটের জোরে দেয়া যাবে সারেঙগিরি পরীক্ষা।' মুরুব্বির মত বলে থার্ড মেট, আফসারউদ্দিন। 'সেই সার্টিফিকট না হলে সবই ফক্কা। তাই ভারী হাতে সারেঙের পায়ে তেল মাখা চাই। তারপর পাশ করে একবার সারেঙ হয়ে নিতে পারলে পায় কে? তখন জমিদার তবিলদার সব একজন।'

'না হে, না, এর মধ্যে একটু কথা আছে। যারা চাটগাঁর লোক তাদের দিকেই সাহেবের একটু টান বেশি।' গলা খাটো করে বলে বিলায়েত আলি, বয়লারের খালাসী। 'নিজের বাড়ি চাটগাঁ কি না। বলে, চাটগাঁ ছাড়া সারেঙ কোথায়? কথায় আছে, সারেঙ শুঁটকি দরগা, এ তিন নিয়ে চাটগাঁ। ধান ডাকাত খাল, এ তিন নিয়ে বরিশাল। সারেঙি করা তো ডাকাতি করা নয়।'

'তোর বাড়ি কোথায় রে ছ্যামরা?' সবাই জিগগেস করে একসঙ্গে।

'এ দেশে।' হতাশ মুখে বলে নাসিম। আর সবাইরও মুখ যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

পরদিন বেদম মার খেল আবদুল। জল মাপতে গিয়ে একটা লোহার কাঠি হারিয়ে ফেলেছে।

মারের সময় কেউ ধরতে আসেনা, ছাড়াতে আসেনা। এ একেবারে গা-সওয়া, নিত্যিকার ব্যাপার। তবু চোখ ছাপিয়ে কান্নার কমতি নেই। নদীর জলে চোখ মুছতে মুছতে আবদুল বলে, 'মাইনের থেকে দাম আর তার সুদ তো কেটে নেবেই, তবু মেরে খামাখা জখম করবে।'

তবু প্রতিবাদ নেই, বিদ্রোহ নেই। নিজের সমর্থনে দুটো কথাও

বলা যাবে না। মার ঠেকাবার জন্যে শক্ত করা যাবে না শরীরের হাড়-মাস।

নাসিম ভাবে এরা সবাই বুঝি তার মত নিরাশ্রয়, মা-বাপ-মরা।

তা কেন? সবাই সিঁড়ি থেকে সুরু করে উঠতে চায় জাহাজের 'ফানিলে'। সবাই সারেঙের সার্টিফিকট চায়। মার দিতে না দিলে ঐ হাতে সে কলম ধরবে কেন?

তাই সেদিন যখন মকবুলের সঙ্গে জল-তোলা নিয়ে ইয়ার্কি মারতে গিয়ে একটা বালতি নাসিম নদীতে ফেলে দিল তখন মার খেতে তার আর লজ্জা বোধ হল না। অপমানের জ্বালা পর্যন্ত লাগল না তার মনে। মকবুলের সঙ্গে, সমস্ত খালাসীর সঙ্গে সে দোস্তালি অনুভব করলে।

'তোর কি! মাইনে নেই, শুধু মারের উপর দিয়েই গেল।' মকবুল কান্নার মধ্যে থেকে বললে, 'আর আমার পূরো মাইনেটাই বালতির অন্দরে কেটে নেবে। পরে মাস-কাবারে বলবে, আমার থেকে আগাম নে। টাকায় দু আনা করে সুদ দিবি। জাহাজে বসেই মহাজনি করে। কেউ আমাদের দেখবার-শোনবার নেই।' বলে উপরের দিকে তাকায়। যেন উপরআলা শুনছেন এই আর্তের ফরিয়াদ।

'অন্য জাহাজে চলে যেতে পারিস না?'

'তুই আছিস কোন তালে? এক জাহাজ থেকে ছাড়ান নিলে আর কোনো জাহাজেই ঠাঁই নেই। সারেঙদের মধ্যে সাঁট আছে। তাই তো মার খেয়েও মুখ বুজে থাকি যেন বরখাস্ত না করে। একবার বরখাস্ত করলেই বরবাদ হয়ে গেলাম। পানি ছেড়ে তখন গিয়ে হাল ধরতে হবে।'

'আর কোন জাহাজেই বা তুই যাবি ?' পাশ থেকে ইয়াদালি ফোড়ন দেয় : 'সব জাহাজেই এই রেওয়াজ।'

'এমনি পালিয়ে যাওয়া যায় না ?'

সবাই হেসে ওঠে। সিঁড়ি থেকে 'ফানিলে' ওঠবার সাধনায় যারা জাহাজে ঢুকেছে, তাদের কাছে এটা নেহাৎ আজগুবি শোনায়।

'আর পালিয়ে যাওয়া সোজা নয়।' গম্ভীর মুখে বলে সেকেণ্ড মেট। 'তোর নাম-ঠিকানা সাহেবের নোটবুকে টোকা আছে। পালাবি আর পুলিশে এজাহার যাবে। বলবে আমার জেবের থেকে মনিব্যাগ নিয়েছে, ঘড়ি নিয়েছে। কোম্পানি লড়বে সারেঙের হয়ে। ছিলি জাহাজে, যাবি জেলে।'

তবে এমনি করেই দিন যাবে নসিমের ? এই একঘেয়ে জলের শব্দ শুনে-শুনে ? মাইনে নেই, থিত-ভিত নেই, এমনি করেই ভাসবে সে দিন-রাত ?

'সাহেবকে খুশি করতে চেষ্টা কর, তা ছাড়া আর পথ নেই। ছাখ্ একবার সিঁড়ি ধরতে পারিস কি না।'

আর কী করে সে খুশি করবে ! যা কাজ তার উপরে সে সাহেবের গা-হাত-পা টেপে, গোসলের আগে তেল মেখে দেয়, চুলে বিলি কাটে। পাকের সময় শুখানি সাহায্য করতে আসে বলেই তার হাড়-মাস এখনো আলাদা হয়নি। তবু মন নেই, মাইনে নেই। বরং জরিমানা বাবদ কিছু তার কাটতে পারে না বলে সাহেবের বড় আপশোষ। তাই মাঝে-মাঝে তাকে উপোস করিয়ে রাখে। সে-সে বেলার লঙ্কা-পেঁয়াজের খরচ বাঁচায়।

চাল নুন লঙ্কা আর পেঁয়াজ সারেঙ জোগান দেয়। আর সব যার-

যার মর্জি-মাফিক। তেল আর মশলা, মাছ আর তরকারি। মাসান্তে মাইনের টাকার থেকে যার-যার চাল-নুন, পেঁয়াজ-মরিচের খরচ কেটে রাখে সারেঙ। তাও তার মর্জি-মাফিক।

'যদি মন চাস সারেঙের, চুরি কর।' কে যেন বলে ফিস্-ফিসিয়ে।

এই ইষ্টিমারের সঙ্গে মাঝে-মাঝে বার্জ বাঁধা থাকে। তাতে বস্তা-বোঝাই চাল যায়, নুন যায়, লঙ্কা যায়। বার্জের সঙ্গে লোক থাকে। তার সঙ্গে কী বন্দোবস্ত সারেঙ-মেস্তুরির, ষ্টোর রুমে চলে আসে চাল আর লবণ, মরিচ আর পেঁয়াজের ছালা। সেই চোরাই মালের উপর আবার মুনাফা মারে।

না, আর ভাল লাগে না। কোনো আশা নেই নাসিমের। এক দিন অন্তর এক দিন একই রাস্তা দিয়ে ইষ্টিমার ঘোরাফেরা করে। যেখানে আসার সময় সন্ধে বেলা সেখানে আসতে কখনো মাঝ রাত, কখনো বা পরদিন ভোর, শুধু এইটুকুই যা বৈচিত্র্য। নইলে একঘেয়ে জলের শব্দ, যাত্রীর ভিড়, নোঙর ওঠা-নামার হড় হড়, সিঁড়ি ও কাছি ফেলবার সময় সেই ডাক-চীৎকার। ভাল লাগে না আর। ক'দিন পর-পর ঘুরে ঘুরে ইষ্টিমার কনকদিয়ায় ফিরে আগে। নদী এত ছোট, তার স্রোত এত দুর্বল, ভাবতে পারত না নাসিম। আগে-আগে মনে হত নদী না জানি চলে গেছে কোন সমুদ্দুরে। এই দেশ থেকে কোন দূর-বিদূরের বিদেশে।

নিরালায় অন্ধকারে নদীর দিকে চেয়ে কখনো একলাটি এসে বসে নাসিম। ঘন কালো জলে জুনিরাত ঝিলমিল করছে। আজ কনকদিয়া এসেছে মাঝ-রাতে। বাড়ি-ঘরের কথা মনে পড়ে নাসিমের। ভাবে,

কোথায় তার বাড়ি-ঘর। তার বাড়ি-ঘর নেই, সেখানে ভূতের আস্তানা। মনে পড়ে মার কথা। মার মুখ। মনে করে, তার মা নেই। তার মা কবে মরে গেছে। মার মরা মুখের মতই মনে হয় এই কালো জলের জ্যোৎস্না।

বড় চুরি না করতে পারে, ছোট ছিঁচকে চুরি কেন করতে পারবে না? দা হাতে করে ডাব বেচতে এসেছে গাঁ-গেরামের লোক, সারেঙ সাহেবের জন্যে কিনলে তুটো দশ পয়সায়। জাহাজে উঠে এসে, সিঁড়ি যখন তুলে নিয়েছে, নাসিম সারেঙের কাছ থেকে একটা একানি নিয়ে ছুঁড়ে দিলে ডাঙার উপর। আর ছ' পয়সা? নাসিম জিভ উলটিয়ে মুখ ভেঙচাল। বেচনদার ছোঁড়াটা নদী থেকে কাদা তুলে ছুঁড়ে মারল নাসিমের দিকে। জাহাজ তখন সরে এসেছে, লাগল না ছিটে-ফোঁটাও। সারেঙ আর নাসিম তু'জনে একসঙ্গে হাসতে লাগল।

এমনি মাছ এসেছে বেচতে। বাঁশপাতা আর গাং-খয়রা। নাও কিছু ছল-চাতুরী করে। তুধ এসেছে হাঁড়িতে, বাঁশের চোঙায় মেপে দেবে। দাম দেব জাহাজে উঠে। ক্ষেতের টাটকা শশা-খিরাই এনেছে ঝুড়িতে করে। ঘুসো চিংড়ি দিয়ে তরকারি হবে, না হয়, অমনি কাঁচা খাব। তোমার দাম মারা যাবে না। আমি সারেঙ সাহেবের চাকর।

এত দিনে একটা নিমা পেয়েছে নাসিম। একখানা পানি-গামছা। লুঙ্গি একখানা পাবে কবে?

চারটে পয়সা চাইল নাসিম।

এমন স্পর্ধার কথা সারেঙ তার জীবনে শোনেনি। চোখ কপালে তুলে সারেঙ বললে, 'কী বললি? পয়সা?'

কী ভীষণ হারামি কথা না জানি বলে ফেলেছে এমনি ভয়-তরাসে চোখে তাকাল নাসিম।

'কী করবি পয়সা দিয়ে ?'

'চা খাব এক খুরি।'

অমনি বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় পড়ল তার গালের উপর। ঘুরে ছিটকে পড়ল নাসিম। সারেঙ গর্জে উঠল : 'এমন বেতরিবৎ। আমার কাছে কি না বিড়ি চায়! বিড়ি কিনবে! চা কিনবে! কোন দিন শুনব বোতল কিনবে! তেরিবেরি করবি তো নদীর গহিনে নিখোঁজ করে দেব।'

চোখের জলে আবার মার কথা মনে পড়ে নাসিমের। মরে গেলে মার মুখ কেমন দেখাবে তাই সে অন্ধকারে জলের দিকে চেয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। মার মরা মুখের কথা ভেবে মনে সে জোর পায়। জোর পায় এই মার সহ্য করতে। মাগো বলেও যদি সে কাঁদতে না পারে, তবে নিঃশব্দে হজম না করে উপায় কি ?

তবু এই অত্যাচারিতের দল একত্র হয় না। খোদ উপরআলা ছাড়া আর কারু কাছে তাদের নালিশ নেই। মুক্তিও নেই এই জাহাজের খোল থেকে। কবে কে সিঁড়ি পাবে, কবে কে পাটাতন, দড়িকাছি, নোঙর-লাইট বা মেস্তরির ইলাকা—তারি আশায় সবাই দিন গোনে। কে কী ভাবে সারেঙের খাতির কাড়তে পারবে। সুদ দিয়ে, ঘুষ দিয়ে, চুরি করে, মার খেয়ে। চমৎকার গভর্ণমেণ্ট চালাচ্ছে সারেঙ সাহেব।

সেই রাত্রেই এক প্যাসেঞ্জারের এক জোড়া জুতো সরাল নাসিম। সারেঙ তা সটান নদীর মধ্যে ফেলে দিলে। বললে, 'বুদ্ধিকে তোর বলিহারি। আমি জুতো মসমসিয়ে বেড়াই আর আমাকে পুলিশে

ধরুক।' পরদিন রাতে নাসিম জোগাড় করলে একটা টিনের স্যুটকেস। সেটাও গেল নদীর গহ্বরে। সেটার মধ্যে মোকদ্দমার নথি, পরচা-দাখিলা, ক' কেতা বেজাবেদা নকল।

কিছুতেই মনের মত হতে পারছে না নাসিম। পারবি, পারবি আস্তে-আস্তে পারবি। সারেঙের চাউনিটা তাই যেন তাকে বলে কানে-কানে। তার অক্ষমতার জন্যে সারেঙ রাগ করলেও তাকে যে সরাসরি মারে না তাতেই নাসিম উৎসাহ খোঁজে।

কোম্পানির আলোতে তেজ নেই, বৃষ্টি নামলে তেরপল নেই, মেয়ে-পুরুষের আলাদা কামরা নেই, তবু সবাইর চোখে ঘুম আছে। এমন ভদ্র যাত্রী নেই যে তাস খেলে বা গান বা খোস-গল্প করে। চাষাভুষোর লাইন। বন্যার তোড়ের মত যারা খাটে, আর তাল-তাল মাংসপিণ্ড হয়ে যারা ঘুমোয়।

ঘুমের অগোছালে ট্যাঁক থেকে কার বেরিয়ে এসেছে টাকার পুঁটলি। নাসিম তা হাত-সাফাই করে তুলে নেয় আলগোছে। একবার ভাবে গুণে দেখি কত আছে। ভাবে পালিয়ে যাই পরের ইষ্টিশানে। কিন্তু কে জানে, কী অদম্য আকর্ষণে সারেঙের কাছেই নিয়ে আসে। প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মত। বাঘের মুখে গরুর মত। যে শুধু মারে, যে হাসিমুখে কথা কয় না, ন্যায্য অধিকারের কাণাকড়িও দেয় না হাতে ধরে, তাকেই খুশি করতে আগ্রহ হয়। যে অনবরত চুকলি শোনে, একের থেকে অন্যকে আলাদা করে রাখে তারই মন পাবার জন্যে কাড়াকাড়ির ধূম পড়ে যায়। কে কাকে হটিয়ে দেবে, চলে তার টেক্কাটেক্কি।

'মোটে সাত টাকা সাড়ে ন' আনা।' বলে মকবুল: 'এতে কী

হবে! ছকুড়ি সাত না হওয়া পর্যন্ত খেলা থাকে না, বলে আমাদের সারেঙ সাহেব।'

তবু কাপড়-চোপড়ের চেয়ে নগদ টাকা ভাল। সব চেয়ে ভাল, যদি হয় কিছু জেওর, সোনা-রূপা। দাম কত আজকাল! কাগজের টাকা তার কাছে রদ্দি, ওঁচা।

একখানা নতুন লুঙ্গি হয়েছে এত দিনে। এবার একটা হাফ সার্ট।

কিন্তু গয়না কোথায় চাষার বউ-ঝিয়ারীদের? বড় জোর নাকে আংটি-চুংটি, হাতে কাচের ঝুরো চুড়ি। সোনাদানা নেই কোথাও।

না, আছে। নতুন বউ যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। গলায় সোনার হাসনা, হাতে বটফুল। পায়ে রূপোর খাড়ু, আঙুলে গুজরি। ফলসা রঙের শাড়ি পরে ঘোমটা টেনে ঘুমিয়ে আছে এক পাশে। বরযাত্রীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এদিক-ওদিক। কে কোথায় চেনবার উপায় নেই। নিফাঁক ভিড় আজ জাহাজে। তবু এরি মধ্যে ফাঁক খুঁজছে নাসিম।

নতুন বউর গলার কাছে নাসিম হাত রাখল। নরম তার গলার কাছটা। আঙুল কাঁপল না নাসিমের। একটানে ছিঁড়ে ফেলল হাসনা।

'চোর! চোর!' ভিড় ঠেলে ক' পা এগুতে-না-এগুতেই নাসিমকে ধরে ফেলল যাত্রীরা। তারপর সবাই তাকে মার লাগাল। প্রচণ্ড মার! যে এসে জিগগেস করছে কী হয়েছে সেও পরক্ষণে মার লাগাচ্ছে। বামাল সরাতে পারেনি চোর, বউর বিছানার গোড়াতেই ফেলে এসেছে। তাতে কি? মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়েছে তো। হার তো ছিনিয়ে গিয়েছিলো গলা থেকে। মার, মার, চাঁদা তুলে মার!

'বাবা গো—' নাসিম চীৎকার করে উঠল।

আচকান গায়ে, কিস্তিটুপি মাথায়, চটি পায়ে সারেঙ এসে হাজির। বলে, 'কী হয়েছে? কে মারছে আমার ছেলেকে?'

ছেলে! সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। সারেঙ সাহেবের ছেলে!

কে বললে, 'ও আপনার চাকর ছিল তো জানতাম।'

'চাকর! মিথ্যে কথা। ও আমার বিয়ার ঘরের ছেলে। আমার মা-হারা সন্তান। ওকে মারে কে?'

'ও গয়না চুরি করেছে নতুন দুলহিনের। গলা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে হাসনা।'

'মিথ্যে কথা। হতেই পারে না! চল, আমি নিজে পুছ করিগে বিবিকে।'

সারেঙ এগিয়ে এল নতুন বউর নজদিগে। বললে, 'আপনার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছে কেউ?'

পরদার বিবি ঢাকা-মুখে গলা খাটো করে বললে, 'না। ঘুমের বেহোঁসে গলা থেকে খসে পড়েছে বিছানায়!'

লতাবাড়ি ইষ্টিশান দেখা যায় কাছাকাছি ; বরের পার্টি নামবে এইখানে। জাহাজ ঢিমে হয়ে এল। নোঙর নামতে লাগল হড়হড় করে।

কাছির বাঁধ পড়ল গাছের সঙ্গে।

'সিঁড়ি দে, সিঁড়ি দে।' উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল সারেঙ: 'নাসিম কই? নাসিমকে ডাক। সে আজ থেকে সিঁড়ি ধরবে।'

খালাসীদের মধ্যে হুল্লোড় পড়ে গেল। নাসিমের দীক্ষা হল এত দিনে, এত অল্প দিনে। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েই কপাল ফিরল তার। আর যারা ধরা পড়েনি তারা এখনো নাকানিচুবুনি খাচ্ছে। সিঁড়ি থেকে পাটাতনে প্রমোশন পাচ্ছে না। আর এ আজ সিঁড়ি,

কাল পাটাতন, পরশু শুখানি, পরে একেবারে সারেঙ, কাপ্তেন, জাহাজ-নাখোদা।

'ধর, ধর, ও ছেলেমানুষ, ও একা কেন পারবে? তোরা সবাই মিলে ওকে সাহায্য কর।' উপর থেকে জোরালো গলায় হুকুম হাঁকে সারেঙ।

সার্চ-লাইটের আলোয় নাসিমের জলে-ভরা চোখ দুটো চকচক করে ওঠে।

নতুন বউ নেমে যাবে লতাবাড়ি। পায়ে গুজরি বাজিয়ে আসছে।

আলো পড়েছে অনেক দূর। গাছ গাছালির মাথায়। সিঁড়ি দিয়ে লগি ধরেছে নাসিম। দুলহিনকে বলছে, 'টলে পড়ে যাবেন। লগি ধরুন।'

না, লগি না ধরেই টলতে লাগল নতুন বউ।

পিছন থেকে কে ধাক্কা মারল নাসিমকে। চমকে চেয়ে দেখে, সেই লোকটা, ভিড়ের মধ্যে সব চেয়ে যে তাকে বেশি মেরেছে। আলোতে চিনল তাকে এতক্ষণে। গহরালি।

আলো থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে গোলবানু। ঘন করে ঘোমটা টেনে দিয়েছে। গায়ের চাদরটা বোরখার মত করে চাপিয়ে দিয়েছে গায়ের উপর। ঘাটে অনেক বিরানা পুরুষের আনাগোনা।

ধরাধরি করে সিঁড়ি তুলতে লাগল নাসিম, একের পর আরেক চিলতে। পাড়ের কাছেকার ঘোলাটে জলের ছায়ায় দেখতে লাগল তার মায়ের মরা মুখ। আর উপরে দাঁড়িয়ে সারেঙ তাকে দরাজ গলায় বাহবা দিচ্ছে। উড়ছে তার শাদা আচকান, শাদা দাড়ি। দিনরাত্ত করে যে সুয্যি যেন তার মত চেহারা।

যশোমতী

বাজার আর ঘাট বিলি হবে এ-সময়, মহলে রিসিভারবাবু এসেছেন। বিলি হবে বাকি-পড়া নিলামী জমি। খাস জমি পত্তন হবে কতক। কাচারিতে বহুলোকের আনাগোনা।

জমিদারির সরিকদের মধ্যে বন্টনের মামলা হচ্ছে। নানান খেচাখেচিতে ডিক্রি আর চূড়ান্ত হতে পারছে না। রিসিভার বসেছে। রিসিভারের হাতেই এখন কর্তৃত্ব। সমস্ত কিছু চলছে এখন তার মুনিবানায়।

আগে জমিদারদের আমলে একটা উচ্ছৃংখল তাণ্ডব চলেছিল। অপব্যয়ের আর অপকর্মের। সে-সব দুঃস্বপ্নের কথা গ্রামের লোক এখনো ভুলতে পারেনি। তার সাক্ষ্য এখনো অনেক ছাড়া-বাড়িতে, মজা-পুকুরে ও ভাঙা-মন্দিরে লেখা আছে । লেখা আছে বেজাবেদা হিসাবের খাতায়।

কিন্তু রিসিভারবাবু একেবারে উলটো জাতের লোক। নায়েব-গোমস্তার মত ঘুষ নেন না বা বে-রসিদে টাকা নিয়ে গাপ করেন না। জমিদারদের মত মদ খান না বা কোথায় কোন বাগদি-বাইতি বা ধোপা-মুচির মেয়ে পাওয়া যাবে তার তালাস করেন না। স্বধর্মনিষ্ঠ, খাঁটি লোক। রাশভারি, নিরপেক্ষ, সূক্ষ্ম নিক্তিতে বিচার করেন। অন্যায়

ক্ষমাও নেই, অন্যায় জুলুমও নেই। লোকে ভয়ও করে কাছেও আসে।

নাম শৈলেশ্বর। বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশ।

'আমার একটা নালিশ আছে বাবু—'

কত নালিশই তো দিন-রাত শুনছেন, শৈলেশ্বর জমা-ওয়াশিলের খাতার থেকে চোখ তুললেন না। বললেন, 'কি নাম তোর?'

'শ্রীনিবাস ঘাসী।'

'কি হয়েছে?'

'আমার পরিবারকে বার করে নিয়েছে হুজুর—'

অন্যরকম নালিশ। শৈলেশ্বর চমকে উঠলেন। মুহূর্তে তাঁর দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠল। গলায় এল প্রায় বাজের হুঙ্কার: 'কে বার করে নিয়েছে?'

শ্রীনিবাস বললে, 'দুগগোচরণ।'

তা হলেও শৈলেশ্বর আশ্বস্ত হলেন না। হিন্দু বলেই এ দুষ্কৃতির শাসন হবে না, তিনি বরদাস্ত করে যাবেন, এ অসম্ভব।

'কে দুগগোচরণ?'

'দুগগোচরণ ভুঁইমালি। ক্রোকে-দখলে ঢোল পেটায়। থাকে পাশ-গাঁয়ে, বাঁশুরিতে।'

'ধরে আনো দুগগোচরণকে।' শৈলেশ্বর হুকুম দিলেন।

ছুটল কাচারির সিং। বরকন্দাজ।

'তোর বউ কোথায়?' জিগগেস-করলেন শৈলেশ্বর।

'খুঁজে পাচ্ছিনা।'

'দুগগোচরণ কোথায়?'

সে আছে তার বাড়িতে।'

'সে-বাড়িতে লুকিয়ে রাখেনি তোর বউকে? দেখেছিস ভালো করে?'

'তন্ন-তন্ন করে দেখেছি। সেখানে নেই। আব কোথাও গুম করেছে।'

'থানায় গিয়েছিলি?'

'গিয়েছিলাম। দারগাবাবুরা গা করেনা। বলে, বায়না দে, তবে এজাহার লিখব। আমি বাবু গরিব মানুষ—' শ্রীনিবাসের নিরুদ্ধ শোক অশ্রুতে ফেটে পড়ল।

'দাঁড়া, আমি শ্লিপ দিচ্ছে ও-সি-কে। সঙ্গে পেয়াদা দিচ্ছি। চলে যা থানায়। দ্যাখ, কি হয়। ভয় নেই, আমি আছি পিছনে।'

বরকন্দাজ ফিরে এসে বললে, 'তুগগোচরণ বাড়ি নেই। তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে।'

শ্লিপে কাজ হয়েছে তা হলে। কিন্তু একা দুর্গাচবণকে ধরে লাভ কি? শ্রীনিবাসের বউকে পাওয়া দরকার।

পরদিন সকালবেলা দুর্গাচরণকে এনে হাজির করা হল।

সারা-রাত পুলিসের হেপাজতে বন্ধ হয়ে ছিল থানায়। বেদম মার খেয়েছে বোঝা যাচ্ছে। পিঠ দগড়া-দগড়া হয়ে গেছে! চোখ-মুখ ফোলা। কিন্তু শ্রীনিবাসের পরিবারের কোনো কিনারা নেই।

'কোথায় রেখেছিস ওকে লুকিয়ে?' শৈলেশ্বর গর্জে উঠলেন, 'ভালয়-ভালয় বার করে দে শিগগির, নইলে খাড়া মারা পড়বি। জেল তো হবেই, ভিটে-মাটি সব উচ্ছন্নে যাবে।'

'এখন সে কোথায় আমি তার কিছুই জানিনা।' দুর্গাচরণ ভার-ভার গলায় বললে। 'সে' কথাটার মধ্যে অলক্ষ্যে যেন একটু আত্মীয়তা ফুটে উঠল। কানে লাগল শৈলেশ্বরের।

'কবেকার কথা জানিস তবে?'

'পরশু যশোমতী আমার বাড়ি এসেছিল সন্ধের সময়। বললে—'

'কে এসেছিল?' পরস্ত্রীর নাম এখন শুভ সারল্যের সঙ্গে উচ্চারিত করবে এ শৈলেশ্বর সহ্য করতে পারলেন না ধমকে উঠলেন।

কিন্তু দুর্গাচরণের কুণ্ঠা নেই। বললে, 'কে আবার! যশো—যশোমতী। শ্রীনিবাসের পরিবার।' বলে পায়ে-দাঁড়ানো শ্রীনিবাসকে ইসারা করলে। সেই সঙ্গে শৈলেশ্বরও তাকালেন শ্রীনিবাসের দিকে। কুঁজো হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে উজবুকের মত। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, অবোলা জন্তুর মত চাউনি। জোর-জবরদস্তি নেই নিতান্ত ল্যাদাড়ে, লেজগুটানো। তার দিকে চেয়ে শৈলেশ্বরের, একবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল, কিন্তু তিনি সামলে নিলেন। শ্রীনিবাস স্বামী। শ্রীনিবাস দুর্বল। শ্রীনিবাস উৎপীড়িত।

দুর্গাচরণের চেহারায়ও কোনো জেল্লা নেই। তবে এক নজরেই চোখে পড়ে তার বয়েস কম, তার সাহস বেশি। তার অনুভবটা পরিষ্কার। স্বীকৃতি নিঃসঙ্কোচ।

'ওদের মধ্যে বয়সে বড় কে?' শ্রীনিবাসকে জিগগেস করলেন শৈলেশ্বর।

'যশোমতীই বড়।' দুর্গাচরণ জবাব দিলে: 'আমার চেয়ে প্রায় বছর পাঁচেকের বড়। তা হলে কি হবে? বলে, আমাকে তুই নাম ধরে ডাকবি। বয়েসে ছোট বলেই তুই ছোট হয়ে যাসনি। মেয়েমানুষের কাছে পুরুষ ছোট-বড় হয় বয়সে নয়, মেয়েমানুষ যে-ভাবে তাকে দেখবে সে-ভাবে। তাই সে আমাকে ডাকত দুগগোচরণ, আমি তাকে ডাকতাম যশোমতী।'

শৈলেশ্বর মার'দেবার হুকুম দিতে জানেন না এমন নয়। ইচ্ছে

হল পায়ের জুতো খুলে নিজেই বসিয়ে দেন ঘা কতক। কিন্তু ভেবে পেলেন না ওর শরীরে মারের আর জায়গা কোথায়। এত বিস্তারিত মার খেয়ে এসেও যে এমন তন্ময় হয়ে কথা বলা যায় শৈলেশ্বর ভাবতে পারতেন না। ভয় নেই লজ্জা নেই আচ্ছাদন নেই।

আগের অসমাপ্ত কথায় তিনি ফিরে গেলেন। বললেন, 'পরশু সন্ধের সময় তোর বাড়ি এসে কী বললে ও?'

'বললে, হতচ্ছাড়া সোয়ামীর ঘর আর করব না দুগগোচরণ। তুই এখান থেকে কোথাও আমাকে নিয়ে চল। দূর-দূরান্তের শহরে গিয়ে দু-জনে কুলি হব তাও ভালো।'

'তুই কী বললি?'

দুর্গাচরণের ফোলা-ফোলা চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। বললে, 'আমি এক কথাতেই রাজি। চাষা থাকি কি কুলি হই আমার কী এসে যায়, যদি যশোমতী সঙ্গে থাকে। আমি শুধু বললাম, এই রাতটা আমার এখানে থাকো, শেষরাতে ধানখালির ঘাটে গিয়ে ইষ্টিমার ধরব।'

'তোর ওখানে যে থাকবে, বাড়িতে তোর পরিবার নেই?'

'ছিল হুজুর। ভাগ্যিমানি গেল-বছর গত হয়েছেন। ভালই গেছেন বলতে হবে, নইলে মনে বড় দাগা পেতেন। করবার কিছুই উপায় থাকত না।'

শৈলেশ্বর হিম হয়ে রইলেন।

'তারপর কী হল?'

'রাতটা আর এরা কেউ ঘনাতে দিলে না। চলে এল থানার দারোগা, কাচারির বরকন্দাজ। ব্যাপারটা ঝাপসা-ঝাপসা টের

পেতে-না-পেতেই আগে-ভাগে যশোমতী সটকান দিলে। এখন দেখতে পাচ্ছি স্রেফ হাওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি পর্যন্ত জানি না।'

তার এই ভনিতায় কান দিলেন না শৈলেশ্বর। কিং-রকম একটা কৌতূহল হচ্ছিল তাঁর, জিগগেস করলেন, 'পুলিশ গিয়ে না পড়লে শেষরাতেই বেরিয়ে পড়তিস দুজনে?'

'রাত শেষ হবার আগেই বেরিয়ে পড়তাম। ধানখালির ঘাটে না উঠে হেঁটে চলে যেতাম সেই পারগঞ্জে। যত আগে ধরা যায় ইষ্টিমার। যত আগে নিবিয়ে ফেলা যায় হাতের লণ্ঠনটা।'

'কোথায় যেতিস?'

'তা ঠিক করিনি তখনো। ইষ্টিমারে উঠে ঠিক করতাম।'

'যেখানে যেতিস সেখানে গিয়ে বিয়ে করতিস যশোমতীকে?'

'বা, বিয়ে করতাম বৈকি। ও কি আমাকে চিরকালই 'তুই' বলবে নাকি? 'তুমি' বলবে না? বিয়ে না করলে 'তুমি' বলবে কবে?'

শৈলেশ্বর ঢোক গিললেন। 'পরের তালাক-না-করা স্ত্রীকে তুই বিয়ে করবি এমন আইন আছে সংসারে?'

উদাসীনের মত দুর্গাচরণ বললে, 'আইনের আমরা কি জানি?'

'কি জানিস মানে?'

'এখান থেকে তো চলেই যাচ্ছিলাম আমরা।'

যেন যেখানে যাচ্ছিল সেখানে কোনোই আইন নেই।

'যেখানেই যেতিস লম্বা জেল হয়ে যেত।'

'জেল হয়ে যেত?' নির্বোধ বিস্ময়ে দুর্গাচরণ বললে, 'পাপ করলাম না, অধর্ম করলাম না, তবু জেল হয়ে যেত।'

'পাপ করোনি হতভাগা ?' আর সহ্য হচ্ছিল না শৈলেশ্বরের। 'পরের বউকে স্বামীর আশ্রয় থেকে বার করে নিয়ে যাচ্ছ, সেটা পাপ নয় ? ঘাড় ধরে হারাম-জাদাকে বার করে দে তো রাস্তায়—'

বরকন্দাজের ঘাড়কাতা খেয়ে দুর্গাচরণ রাস্তার উপর পড়ল মুখ থুবড়ে। শৈলেশ্বরের মনে হল শ্রীনিবাসকেই বুঝি ফেলে দেয়া হল ভুল করে। কিন্তু না ভুল হবে কেন। শ্রীনিবাস স্বামী, তার কোনো অপরাধ নেই।

'এখনো যদি খোঁজ দিতে পারিস যশোমতীর, জেল থেকে রেহাই পাবি। নইলে রক্ষে রাখব না।'

'খোঁজ তো এখন আমারই চাই।' গায়ের ধূলো ঝাড়তে-ঝাড়তে দুর্গাচরণ বললে, 'কিন্তু ওর ছেলের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন ?'

ছেলে ? ওর আবার ছেলে আছে নাকি ?

হ্যাঁ, আছে একটি আট-নয় বছরের। রজ্জব আলি চৌকিদারের বাড়ি কাজ করে। খেতালি-রাখালির কাজ। আরো দুটি ছিল ছোট-ছোট। বছর দুই আগে মারা গেছে পর-পর। যে-বছর চালের দর হয়েছিল আশি টাকা, সেই বছরই শ্রীনিবাস একটু বিদেশ গিয়েছিল টাকার জোটপাট করতে। ফিরে এসে দেখে এই কাণ্ড। এরি মধ্যে মনের মত নাগর জুটিয়ে নিয়েছে যশোমতী।

ডাক রজ্জব আলিকে।

কি ব্যাপার ? শ্রীনিবাসের পরিবার তোমার বাড়িতে আছে নাকি ?

সেকি কথা ? রজ্জব আলির প্রায় ভির্মি যাবার দাখিল।

'তোমার বাড়িতে ওর ছেলে কাজ করে তো ? তাকে দেখবার জন্যেও তো ওর মা যেতে পারে সেখানে।'

'কার ছেলে ? ও তো আমার ছেলে। আমি ওর পালক-পিতা। রজ্জব আলি তেজী গলায় বললে, 'আমি ওকে নগদ কুড়ি টাকায় কিনেছি। শ্রীনিবাসই বেচেছে হাতে ধরে।'

কথাটা সত্যি, শ্রীনিবাস অস্বীকার করতে পারল না। দুর্ভিক্ষের বছর বেচে দিয়েছিল সে ছেলেকে। যাতে সে না মরে, যাতে দুটি তারা বাপে মায়ে খেতে পারে দু'দিন।

না, এখনো মসজিদে কলমা পড়ায়নি ছেলেকে, নাম আগের মত সেই প্রহ্লাদই আছে। বেশ, টাকা ফেরৎ দিচ্ছেন শৈলেশ্বর, সুদও দিচ্ছেন কিছু, বাপের কাছে পাঠিয়ে দিক প্রহ্লাদকে। আইন-কানুনই ছিল না, তখন আবার দান-বিক্রি কি! সে-দুঃসময়ে লোকের বুদ্ধি-বিবেচনাই লোপ পেয়ে গিয়েছিল। শ্রীনিবাসও সেই সব হাড়-হাবাতের দলে। তার ঘর-বাড়ি রুজি-রোজগার সব তছনছ হয়ে গিয়েছে। তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। ফিরিয়ে দিতে হবে তার ছেলে। ফিরিয়ে আনতে হবে তার পরিবার।

রজ্জব আলির আপত্তি নেই।

কিন্তু আপত্তি প্রহ্লাদের। বাপের কাছে কিছুতেই সে ফিরে যাবে না।

'কেন ?'

'মা বারণ করে দিয়েছে।'

শৈলেশ্বর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'যে-বাপ ছেলেকে খাওয়াতে পারে না, টাকার জন্যে ছেলেকে বিক্রি করে দেয় মুসলমানের কাছে, মা বলেছে, সে-বাপ বাপই নয়।'

বড় তেজের কথা। এ-তেজ সে নিশ্চয়ই শ্রীনিবাসের-থেকে

পায়নি। পেয়েছে যশোমতীর থেকে। কেমন দেখতে না-জানি যশোমতীকে। এতক্ষণে এই প্রথম শৈলেশ্বরের মনে হল।

'মাকেও বিক্রি করে দিয়েছিল দু'বার।' আগাম টাকা নিয়ে এসেছিল বেপারীদের ঠেঙে। কিন্তু মা যায় নি, নড়েনি বাড়ির দরজা ছেড়ে?'

'কারা তারা?'

'রহমালি আর কাঞ্চন।' বললে দুর্গাচরণ।

ডাক তাদের।

তারা এসে বললে, খবরটা মিথ্যে নয়। দু'-দুবার দু'জনের কাছে বউ বেচে টাকা নিয়েছে শ্রীনিবাস। টাকা নিয়ে সটকান দিয়েছে। কিন্তু তারা দখল পায় নি যশোমতীর। দখল নিতে গেলে বারে-বারে ঠেকিয়ে দিয়েছে দুগগোচরণ। গরু বেচে, ধান বেচে, জমি বেচে কিস্তিতে-কিস্তিতে টাকা শোধ দিয়ে দিয়েছে। তবু বিপথে যেতে দেয় নি যশোমতীকে। ভিক্ষুকের অধম হতে দেয় নি।

'তাইতো যশোমতী একদিন বললে, আমাকে তুই বিয়ে করে ফেল, দুগগো। আমার জন্যে কত আর তুই খেসারত দিবি। আমাকে তুই বিয়ে করে ফেললে কেউ আর আমাকে শ্রীনিবাসের বউ বলতে পারবে না। শ্রীনিবাসও পারবে না আমাকে বিক্রি করতে, আর করলেও সে-বিক্রি টিকবে না, বাতিল হয়ে যাবে।' দুর্গাচরণের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তাই বলে পরের স্ত্রী তুমি আত্মসাৎ করবে? এটাই বা কোন সৎপথ?' শৈলেশ্বর হুঙ্কার ছাড়লেন: 'এ-হারামজাদা বলে কী অসম্ভব কথা! বার করে দে ঘাড় ধরে।'

দুর্গাচরণ আবার ঘাড়ধাক্কা খেল।

যে যাই বলুক, শ্রীনিবাসকে আবার তিনি জায়গা করে দেবেন। বান-চাল নাস্তানাবুদ হয়ে গিয়েছিল সে, আবার ফিরিয়ে দেবেন তাকে শক্ত ভিত্তির আশ্রয়। প্রথমেই যশোমতীকে ফিরিয়ে আনতে হবে। যশোমতী এলে তার হাত ধরে প্রহ্লাদও তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসবে। ততদিন সে কাচারিতেই থাক, ছুটকো চাকরের কাজ করুক। মা এসে পড়লে তাব আর রাগ থাকবে না।

ছিন্নভিন্ন বিপর্যস্ত শ্রীনিবাসের জন্যে শৈলেশ্বরের সহানুভূতির অন্ত নেই।

বড় তেজী মেয়ে যশোমতী। তা হোক। তবু বুঝিয়ে বললে বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই। নিদারুণ দুর্বিপাকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল শ্রীনিবাসেব? কার না হয় শুনি? এর চেয়ে আরো কত ভয়ংকর কাণ্ড লোকে করে বসে। যশোমতী যে স্বামী বেঁচে থাকতে দুর্গাচরণকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এটা সেই দুর্বিপাকের পরিচয়। না, ওদের মধ্যে আবার তিনি ফিরিয়ে আনবেন বনিবনা। শ্রীনিবাসকে মহলের আটপ্রহরী করবেন, কিছু জমি দেবেন চাকরান। নতুন করে ঘর তুলে দেবেন ওদের। ওদের জীবনে নিয়ে আসবেন শক্ত অব্যাহতি! সময় সুগম হয়ে উঠলেই আবার ওদের মধ্যে স্বীকৃতি ফুটে উঠবে। যে দুটো ছেলে মরে গিয়েছিল, আবার ফিরে আসবে যশোমতীর কোলে।

কিন্তু যশোমতী কোথায়?

যশোমতীর দেখা নেই।

ওদিকে পুলিশ, এদিকে জমিদারের লোকলস্কর, কোন পাত্তাই

পাওয়া যাচ্ছেনা। সন্দেহ-অসন্দেহ সব জায়গায় তদন্ত হচ্ছে, কোথায় কে যশোমতী! ঘাটে-অঘাটে প্রত্যেকটি নৌকোর উপর কড়া নজর, এমন সোয়ারী কেউ নেই যাকে তখুনি-তখুনি সনাক্ত করা যায় না। অলিতে-গলিতে, হাটে-বাজারে পাহারা। কিন্তু যশোমতী নিরুদ্দেশ।

কোথায় সত্যি যেতে পারে? যা জানা যাচ্ছে হাতে তার পয়সা ছিল না, সময় ছিলনা ষ্টিমার ধরে। এমন সাহস নেই নৌকো নেবে একলা। এখানেই কোথাও আছে। নিশ্চয় লুকিয়ে রেখেছে কেউ। কোনো গভীর অন্তঃপুরে।

তবে কি কোনো অবস্থাপন্ন মুসলমান তালুকদার তাকে গায়েব করেছে? বিশ্বাস হয় না। নগদ টাকায় খরিদ হয়েও যার দখল হয় না সে নিজের থেকেই গিয়ে ধরা দেবে এ অসম্ভব কথা। তেমনি অসম্ভব কথা সে আত্মহত্যা করেছে। এত যার তেজ সে কখনো আত্মহত্যা করে না।

আর কিছু নয়, শয়তান ঐ দুর্গাচরণ, সেই কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। তাই ওকে আর চোখের বাইরে ছেড়ে দেয়া নয়, সব সময়েই পিছনে ওর লোক রয়েছে। হয় পুলিশের নয় জমিদারের। ও টেরও পায় না।

চাষবাসে আজকাল আর বিশেষ মন নেই দুর্গাচরণের। কেমন ছন্নছাড়া সর্ব্বস্বান্তের মত ঘুরে বেড়ায়। কোথায় কি খায় না-খায়, বড় কাহিল হয়ে পড়েছে, ঘরে না গিয়ে মাঝে-মাঝে বাইরে পড়ে থাকে। আর, সব খবর নিয়মিত রিপোর্ট হয় শৈলেশ্বরের কাছে। তবু, সন্দেহ নেই, এই দুর্গাচরণের থেকেই সন্ধানের সূত্র পাওয়া যাবে।

গুপ্তচরদের উৎসাহ দেন শৈলেশ্বর। প্ররোচনা জোগান। যশোমতীর উদ্ধারের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেন।

কিন্তু কোথায় যশোমতী!

মাঝে-মাঝে উড়ো খবর আসে। আজ নাকি ইয়াকুব গাজীর পুকুরে ওকে কে স্নান করতে দেখেছে। আরজ আলির উঠোনে ওর শাড়ি শুকোচ্ছে নাকি আজ। কিংবা আজ নাকি আতাহার মিঞার খলেনে ও ধান কুটছে।

ডাক ইয়াকুবকে। তলব দেও আতাহারকে। আরজ আলিকে ধরে নিয়ে এস।

সবাই প্রথম বাক্যেই অস্বীকার করে। তার চুলের ডগা, চোখের পলকটিও কেউ দেখেনি। হ্যাঁ, পুলিশ-তদন্ত হোক। তস্তুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবু আশা হারান না শৈলেশ্বর। যে-রকম জাল পেতেছেন, ঠিক সে ধরা পড়বে। ঠিক আবার তাকে তিনি মিলিয়ে দিতে পারবেন স্বামীর সঙ্গে। তাই তিনি শ্রীনিবাসকে নতুন কাপড়-জামা কিনে দিয়েছেন, রেখেছেন পরিষ্কার ফিটফাট করে। কাচারিতে চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন একটা। তার জীবনে এনে দিয়েছেন একটা ভদ্রতার পরিবেশ। স্বামীত্বের মর্যাদা। এবার এনে দেবেন স্ত্রীর প্রেম, গৃহবাসের শাস্তি।

তবু শত ফিটফাট ছিমছাম হলেও লোকটাকে কেমন যেন অপদার্থ মনে হয়। মনে হয় সে যোগ্য নয় যশোমতীর।

যোগ্যতার প্রশ্ন কি আর ওঠে? সে স্বামী। এখন ওঠে অধিকারের কথা।

মাঝে মাঝে তার সঙ্গে গল্প করেন শৈলেশ্বর। একটু বা নিঝুম নিরিবিলিতে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানতে চান তার গেরস্থালির ইতিহাস। একেকবার ইচ্ছে করে প্রশ্ন করেন, কেমন দেখতে যশোমতীকে। মুখের থেকে ফিরিয়ে নেন প্রশ্নটা। ভয় হয়, লোকটা যেমন মিথ্যেবাদী, হয়তো বলে বসবে, কদাকার, জঘন্য। স্ত্রী বলেও বিন্দুমাত্র তার মায়া হবে না।

কিন্তু শৈলেশ্বর অনুভব করেন এত যার তেজ, এত যার জ্বালা, সে সুন্দর না হয়ে যায় না। সে-সৌন্দর্য বোঝে শ্রীনিবাসের সাধ্য কি ?

যশোমতীকে যদি পাওয়া যায় তবে তাকে তিনি পাশের হাজত-ঘরে রেখে দেবেন এক রাত্রি, অন্ধকারে গিয়ে চুপি চুপি আলো জ্বালাবেন। দেখবেন তার সেই তেজ, তার সেই জ্বালা।

অধিকারের প্রশ্ন কি আর ওঠে ? তিনি প্রভু। এখন ওঠে আধিপত্যের কথা। শৈলেশ্বর ভয় পান। কিন্তু প্রভাত তো হবে। স্বামী-পুত্রের চাকরি হয়েছ, জমি হয়েছে, ঘর উঠেছে, দিনের আলোতে চোখ মেলে দেখবে না যশোমতী ? তার জীবনের সমস্ত রাত্রি সে মুছে ফেলবে না ?

স্বপ্ন দেখছিলেন শৈলেশ্বর। চর এসে বললে, 'যশোমতীকে পাওয়া গেছে।'

শৈলেশ্বর চমকে উঠলেন। বিশ্বাস করবেন কিনা বুঝতে পারলেন না।

'এখানে নিয়ে আসব ?'

এখন মোটে সন্ধে। শৈলেশ্বর গলা নামিয়ে বললেন, 'এখন নয়। মাঝরাতে।'

মাঝরাতে ফরাসে চুপচাপ একা বসেছিলেন শৈলেশ্বর। উচ্চ-শিখায় লণ্ঠন জ্বলছে তাঁরই প্রতীক্ষার মত।

'তুমিই যশোমতী ?'

জিগগেস করবার দরকার ছিল না। শৈলেশ্বর এক পলকেই তাকে চিনতে পেরেছেন।

কিন্তু তার কপালে সিঁদুর, ডগডগে সিঁদুর। ঐটেই তার তেজ। আর তার চোখে ও কি জল ? না ঐটেই তার অপূর্ব জ্বালা।

জয়ী হয়েছেন শৈলেশ্বর। অনুতপ্ত হয়ে যশোমতী তার স্বামীর আশ্রয়ে আনুগত্যের অভিজ্ঞান নিয়ে ফিরে এসেছে।

তবু এ সৌন্দর্য আস্বাদ করে এ যোগ্যতা শ্রীনিবাসের নেই, হয়তো অধিকারও নেই।

চর কাচারিরই পেয়াদা শৈলেশ্বর হুকুম করেলেন, 'একে হাজত-ঘরে বন্ধ কর।'

ঘর খুলল পেয়াদা। ঝাঁট দিয়ে ধুলো ঝাড়ল। নতুন একটা লণ্ঠন জ্বালল মিটিমিটি।

'তোমাকে আজ রাতে ঐখানে থাকতে হবে।' বললেন শৈলেশ্বর।

'ঐ নোংরা ঘরে, শুকনো মেঝের উপর ?' পান-খাওয়া ঠোঁটে হাসল যশোমতী : 'তার চেয়ে আমার ঘরে চলুন, নরম লেপ-তোষক কিনেছি।'

'তোমার ঘর ?' শৈলেশ্বর যেন চাবুক খেলেন।

'হ্যাঁ, আমি যে ঘর নিয়েছি খালপাড়ে।'

'খালপাড়ে ?'

'হ্যাঁ, যেখানে খারাপ মেয়েদের বস্তি। চেনেন না?

আপনারাই তো জমির খাজনা পান।'

'কেন? সেখানে কেন?' শৈলেশ্বর চেঁচিয়ে উঠলেন।'

তা ছাড়া কোথায় আর যেতে পারে যশোমতী! কোথায় গিয়ে সে মুক্তি পেতে পারে স্বত্বহীন স্বামিত্বের দাবি থেকে? জমিদার আর পুলিশ তার জন্যে আর কোথায় জায়গা রেখেছে, আর কোথায় তার আশ্রয়! তাড়া-খাওয়া ইঁদুরের মত সে ঢুকে পড়েছে আঁস্তাকুড়ে। কোনো ঘাটেই নোঙর ফেলতে না পেরে সে ডুবেছে পাঁকের মধ্যে।

কিন্তু সে মুক্ত। সে অধরা। তাকে আর কেউ ধরে রাখতে পারে না।

'তাই আমাকে আপনি আর বন্ধ করতে পারেন না। আমার সম্বন্ধে আর কোনো ওজুহাত নেই, আকর্ষণও নেই।' যশোমতী শব্দ করে হাসল: 'আমার কপালে যে সিঁদুর সে আমি স্ত্রী বলে নয়, আমি চিরকালের সধবা বলে। যাবেন আমার ঘরে?'

'না।' শৈলেশ্বর চীৎকার করে উঠলেন।

অনেক রাতে যশোমতীর বন্ধ ঘরের দরজায় কে করাঘাত করল।

'কে?'

'আমি ছুগগো—ছুগগোচরণ।'

'মদ খেয়ে এসেছিস? মদ খেয়ে না এলে ঢুকতে দেবনা। আর আর দিনের মতো তাড়িয়ে দেব।'

'না, মাইরি বলছি, ঠেসে টেনে' এসেছি আজ।' জড়ানো গলায় বলতে লাগল দুর্গাচরণ : 'দাঁড়াতে পারছি না, টলে টলে পড়ছি। দরজা খুলে দে শিগগির, নইলে মাথা ঠুকে-ঠুকে দরজা ভাঙব।'

না, ভুল নেই, মাতাল হয়ে এসেছে দুর্গাচরণ। যশোমতী দরজা খুলে দিল।



নতুন দিন

বাকি-পড়া জমি নিলেম হয়ে গেছে। কিনেছে তৃতীয় পক্ষ।

তবু শেষ হয়নি। পরবর্তীকালের খাজনা বাকি আছে। সে আবার কি? তর্জমা করে বুঝিয়ে বলো।

যে-মামলার ডিক্রি-জারিতে নিলেম হয়েছে সে-মামলার রুজুর তারিখের পর থেকে নিলেম বহাল না হওয়া পর্যন্ত জমি খেয়েছে তো জোনাবালি! তা তো খেয়েইছি। খেয়েছ তো সে সময়ের খাজনা দেবে না?

জোনাবালির মুখ বিরস হয়ে গেল। মিথ্যে কি, পরবর্তী সময়ের খাজনা তো শোধ হয়নি।

তার কী হবে?

তার জন্যে মালেক সুন্দর খাঁ ফের মামলা করল। সমন যাচনা করলেও নিলনা জোনাবালি। হাজির-লটকানো জারি হল সমন। ডিক্রি হল এক তরফা। জোনাবালি ছানি করল। ফল পেল না। করল আপিল। করল মোশন্। সুরু হল ঝটাপটি। কিন্তু শেষপর্যন্ত সুরাহা হল না। সুন্দর খাঁর ডিক্রি বজায় রইল।

সেই ডিক্রি ফের জারিতে দিয়েছে। সুন্দর খাঁ এবার ধরতে চাইছে জোনাবালির অন্য সম্পত্তি। অন্য জমার জমি। বাড়ির বগলে সতেরো গণ্ডার বন্দ।

পিওনকে বলেছিল জোনাবালি, নোটিশ গরজারি দিন। পিওন রাজি হয়নি। জোনাবালির চেয়ে সুন্দর খাঁর হাত অনেক দস্ত-দরাজ।

আচ্ছা, জোনাবালিও নিরস্ত্র নয়। সে সালিশী বোর্ডে দরখাস্ত করল। এক নোটিশে বন্ধ হয়ে গেল ডিক্রিজারি।

কখন আবার যে ভারি হাতে তদবির করে বোর্ডের মামলা সুন্দর খাঁ খারিজ করিয়ে দিলে জোনাবালি কেন কাকপক্ষীও জানতে পারল না।

বাঁধন খুলে ডিক্রিজারি ফের বলবন্ত হয়ে উঠল।

ছেঁড়ার উপরে চলছে এমন জোড়াতালি, দেশে ভোট এল। গাঁ-গেরাম গরম হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

মামলা-মোকদ্দমা পড়ে রইল, খেত-খামার পড়ে রইল, দুঃখ-ধান্দা পড়ে রইল, সবখানে কেবল ভোট আর ভোট। তোমার ভোট আছে তো বড় মিয়া? কাকে দিচ্ছ ভোট? ইউনিয়ন নম্বর কত তোমার? নাম উঠেছে তো লিষ্টিতে? জওজের নাম বাপের নাম হয়ে যায়নি তো?

ভোট কাকে বলে ঝাপসা ঝাপসা বোঝে জোনাবালি। সবাই মিলে বলে-কয়ে ধরাধরি করে একজনকে শুধু বড়লোক করে দেয়া। যেমন সবাই করেছে এই বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে, বক্সো-সাহেবকে। সবাই মিলে ভোট দিল আর ফাঁকতালে উনি একজন জোরমন্ত লোক হয়ে দাঁড়ালেন। ঢেউটিনের ঘর হল পাঁচ সাতখানা, সনামা বিনামা বিত্তসম্পত্তি হল, টিপকল বসল বাড়ির নগিজে, গরু মোষে খেত-খামার জাঁকিয়ে উঠল দেখতে দেখতে। সেই থেকে হল সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান, ফুডকমিটির সেক্রেটারি। আর যারা ভোট দিল তাদের কি অবস্থা। তাদের খাওনপিরনের কষ্ট, ঘরে এক ফোঁটা কেরাসিন

নেই, গরুবাছুর দল-ঘাস খেয়ে বেড়ায়। এক দিকে শান অন্য দিকে শেওলা। ভোটের কি মানে জানা আছে জোনাবালির।

আরে, এ গেরামি ভোট নয়। এ দিল্লির ভোট।

জোনাবালির মাথা ঘুরে যায়। চোখে ধাঁধা লাগে।

'হ্যাঁ, ঠিকমত সবাই এবার ভোট দিতে পারলে আমরা আবার বাদশা হব।' বলে সেরাজ মিয়া। শহর থেকে লোকলস্কর নিয়ে সে ভোট-তদন্তে এসেছে।

'সবাই মিলে বাদশা হব কী মিয়া?' জোনাবালি প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় না।

'হ্যাঁ, সবাই মিলেই বাদশা হব।' সেরাজ মিয়া হটে না, জোর করে বলে: 'সবাইর অবস্থা তখন বাদশা-নবাবের মত সচ্ছল হবে। থাকবে না দুঃখকষ্ট, অভাব-অনটন। ভাতের অভাবে মরবে না আর কেউ। থাকবে না আর কেউ এমন মুখখু হয়ে। দিন ফিরবে এবার।'

দিন ফিরবে এবার! শুনতেও কেমন ভাল লাগে।

জোনাবালি বললে, 'আমিরি-উমিরি চাইনে হুজুর। রাতে একটু কেরাসিন পাব? পিন্ধনের কাপড় পাব একখানা?'

মাঠে ফসল আর মারা যাবে না? খিল যাবে না জমি? বাটি-ঘটি বাঁধা পড়বে না? ধার-কর্জ মুছে যাবে দেশ থেকে?

'সব ঠিক হবে, কিন্তু মনে থাকে যেন, ভোট দেবে লতিফ সরদারকে।'

'আর খবরদার, হানিফ শিকদারকে নয়।'

লতিফ সরদার খোদার খাসবান্দা। আর হানিফ শিকদার ফেরেববাজ, বেইমান।

সুন্দর খাঁর হাতে ভোটারের লিষ্টি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সবাইর নাম ঠিকমত উঠেছে কিনা। যদি না উঠে থাকে তো মোক্তাম দিতে হবে। শুধরে নিতে হবে লিষ্টি। একটি নামও ফসকাতে দেয়া হবে না। কে জানে এক ভোটেও জিৎ হতে পারে। ফোঁটা ফোঁটা জলেই বৃষ্টি নামে মাঠ ভরে।

'আরে, জোনাবালিরও দেখছি ভোট আছে।' সুন্দর খাঁ হেসে তাকায় জোনাবালির দিকে।

হ্যাঁ, তারও খানা আছে, ট্যাকসো আছে, হালগৃহস্থি আছে। সে-ও এবার সুদিনের নৌকোর সোয়ারী।

জোনাবালিও হাসল সুন্দরের দিকে চেয়ে।

সুন্দর লেখাপড়া জানে, জোনাবালি নিরক্ষর। সুন্দর মুনিব, জোনাবালি প্রজা। সুন্দর মহাজন, জোনাবালি দায়িক। কিন্তু দুজনের মাঝে নেই আর কোন শত্রুতালি। নতুন দিনের আশায় দুজনেরই চোখে আজ ঘোর লেগেছে। সুন্দরকে আর খাজনার জন্যে তাগাদা দিতে হবে না, জোনাবালিকেও হবে না আর হালের বলদ বেচতে। সুন্দরও তখন মুক্ত লোভের থেকে, জোনাবালিও তখন মুক্ত লজ্জার থেকে।

মুখতাকাতাকি করে আবার হাসল দুজনে। দুজনের মাঝে নেই আর কোনো আকচাআকচি। নতুন দেশের হাওয়া ছুঁয়েছে দুজনকে।

আমরা আবার বাদশা হব নিজের এলাকায়।

'কিন্তু খবরদার, লতিফ সরদারকে ভোট দেবে।'

কে লতিফ, কে হানিফ, ন্যাজামুড়া কিছুই বোঝে না জোনাবালি। সে শুধু এইটুকু বোঝে ঠিকমত ভোট দিতে পারলেই পয়মন্ত দিন এসে

দেখা দেবে। হালের মুখ যাবে ঘুরে। একটা হাজাশুকা নোনাশিকস্তি দেশের থেকে চলে আসবে তারা ফসল-গুলজারের দেশে।

কাপড় পাবে, কেরাসিন পাবে, গোলার ধান দালাল-ফড়েরা কিনে-কেটে নেবে না। তামাম বছর খেতে পারবে দিয়ে-থুয়ে। দাম কমবে জিনিসের। চিকিৎসার অভাবে জোয়ান-মর্দ ছেলেগুলো আর মরবে না তড়পে-তড়পে। লাভে-মূলে সব ফিরে আসবে। খোদা আর বেরাজী থাকবেন না।

আর, একেই তো বলে রাজত্ব পাওয়া। একেই তো বলে নবাব-নাজিমের দেশ।

জোনাবালির চোখে আর ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগে না, যেন আলো দেখতে পায় আসমানে। বুকের মধ্যে বিশ্বাসের জোর আসে।

হুলুস্থুল লেগে গেছে। নৌকো করে দলে-দলে লোক আসছে লতিফ সরদারের। চেঁচামেচি করে কানে তালা লাগাচ্ছে। উর্দু-ফারসি নানারকম বুকনি ছুঁড়ছে। মানে কিছু বোঝে না জোনাবালি, কিন্তু রক্তে হঠাৎ ঝাঁজ আসে। মনে হয় বয়েস কম থাকলে সেও অমনি দাপাদাপি করত লাঠি নিয়ে।

কিন্তু হানিফ সিকদার কই ?

তার লোকেরা সব ফেরার হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে আসতে দেয়া হয়নি এ-অঞ্চলে। আসবে তো লাঠি খাবে। ইট পাটকেলে কানা হয়ে যাবে।

কেন, তাদের কেন এ দশা ?

'হানিফ দুষমন। হানিফ বেইমান।' লতিফ সরদারের পাটোয়ার সুন্দর খাঁ বলে গলা ফুলিয়ে।

অত প্যাঁচোয়া ব্যাপার বুঝতে পারে না জোনাবালি। অত চুলচেরা তর্ক।

'অত সব বোঝা তোমাদের কারবার নয়, কাজও নেই বুঝে। শুধু এইটুকু জেনে রাখ ভোট দেবে লতিফ সরদারকে।'

লতিফ সরদারকে। সবাইর মুখে ঐ এক কথা। এ-পাড়া, ও-পাড়া, সবাই এক জোট। প্রেসিডেন্ট-চৌকিদার, মোল্লা-মুন্সি, প্রজা-মুনিব, গোমস্তা-পেয়াদা, মহাজন-খাতক, সবাইর মুখে এক মন্ত্র।

জোনাবালির মনে আর সন্দেহ থাকে না। সে ঘরে গিয়ে ঘরের মানুষকে বলে, 'এবার আর দুঃখ থাকবে না হালিমের মা—'

হালিমের মা শোনেনি এমন গজব কথা। দুঃখ থাকবে না মানে রাতের বেলায় আন্ধার থাকবে না। এ কখনো হয়?

'কেন, নতুন কর্জদাদন পাবে বুঝি?'

'না গো না। তুমি বড় কম বোঝ। কর্জটর্জ সব উঠে যাবে। ধার খেতেও হবে না, দিতেও হবে না। আইন-কানুন সব বদলে যাবে। প্রজা উচ্ছেদ করার আইন ছিল না এত দিন? এবার দুঃখ উচ্ছেদ করার আইন হবে।'

হালিমের মা হাঁ করে রইল।

'হ্যাঁ গো, আমাদেরই জাত ভাই কে এক মিয়া নতুন বাদশা হবে।'

কোথাকার কে মিয়া দিশ পায় না হালিমের মা। কিন্তু তাতে তাদের কি? কে না কে তক্ত-তাউস পাবে, তাতে তাদের এই হোগলা-পাটির কী এসে যায়?

'তাতে আমাদের কি?'

'তুই চিরকালই একটু কম বুঝিস। আমাদের কি? আমাদেরই

তো সব। নতুন বাদশা এসে নতুন ফরমান জারি করবে। বৃষ্টি হবে সময় মত, বাতবন্যা হবে না, ধান আর খেয়ে যেতে পারবে না পাখিতে। খাজনা-টাজনা সব মাপ হয়ে যাবে, যার চাষ তারই খাস হয়ে যাবে জমি-জায়গা।'

'কাপড় পাব ?'

'পাবি, পাবি। শাড়ি পাবি, জেওর পাবি। নাকে বটফুল, কানে ঝোমকা। খোঁপায় বেড়চিরন দেব গড়িয়ে। ধুলোর মত সব সস্তা হয়ে যাবে।'

'ধান সেদ্ধ করার জন্যে রাতে কেরাসিন পাব ?'

'জুনি রাত হয়ে থাকবে সব সময়।'

'হালিম-জালিম দু ভাই-ই জ্বরে ধুঁকছে পড়ে-পড়ে। লাটা ফলে অর ছাড়ছে না। ফকিরের ঝাড়ফুঁকও মিছে হচ্ছে। ওদের জন্যে ওষুধ আনতে পারবে ?'

'বলিস কি ? প্রত্যেক গাঁয়ে দাওয়াইখানা বসবে, কুইনিন বিলোবে বিনি পয়সায়।'

হালিমের মা তার ঘরের পুরুষের কাছটিতে ঘন হয়ে বসে। নতুন দিনের পদধ্বনি শোনে।

'জানিস হালিমের মা, আমার নাম বেরিয়েছে ছাপার অক্ষরে। সরকারী লিষ্টিতে। যারা যারা বাদশা বানাতে পারবে তাদের নামের ফিরিস্তি। আমরা সবাই বললেই নতুন বাদশা বসবে। আমরা সবাই বললেই দুঃখ দূর হয়ে যাবে আমাদের। তুই অত সব বুঝবি না হালিমের মা। তুই শুধু বসে থাক আমার পাশটিতে।'

কবে ভোট হবে, সুন্দর খাঁকেই একদিন জিগগেস করে জোনাবালি।

'দিন ঠিক হয়নি এখনো।'

দিন ঠিক হলেই সবাইকে তারা নিয়ে যাবে শহরে। ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। হ্যাঁ, খোরাকি পাবে, রাহা-খরচ পাবে, আর যারা নেহাৎই অবাধ্য পাবে তারা হয় ঘুস নয় ঘুসি।

না, না, জোনাবালি অবাধ্য নয়। সে খোরাকি-খরচও চায় না।

তবু যদি সে ব্যস্ত হয়ে থাকে, তার কারণ হালিমের মার পরনের শাড়িতে আর সেলাই চলে না, ছেলে দুটো জ্বরে ভুগে-ভুগে কাঠি হয়ে গেছে, ঠিক সময়ে বৃষ্টি হয়নি বলে ধান পুষ্ট হয়নি এ বছর। সে চায় যত শিগগির পারে উলটিয়ে দেয় এই দিনের পৃষ্ঠাটা।

সত্যি, ওলটাল বুঝি পৃষ্ঠা। তার উকিলের মুহুরি এসে খবর দিল, সুন্দর খাঁর ডিক্রিজারি খারিজ হয়ে গেছে।

বলেন কী? জোনাবালি বিশ্বাস করতে চাইল না।

হ্যাঁ, আইন অনেক বদলে গিয়েছে এর মধ্যে। খাজনার ডিক্রিতে বাকিপড়া জমি ছাড়া আর কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ধরা যাবে না। এইখানে বাকি-পড়া জমি যখন আগেই নিলেম হয়ে গেছে তখন জোনাবালির আর কোনো জমি-জায়গা ক্রোক হতে পারবে না।

প্যাঁচঘোঁচ বোঝে না অত জোনাবালি। উজু করে সে নামাজ পড়তে লাগল। তাড়াতাড়ি করে উলটে যাক পৃষ্ঠাগুলি। এই পচা পুঁথিটা শেষ হয়ে যাক।

তারপর একদিন মাঠে সে লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটছে, আসে

দাঁড়িয়ে সুন্দর খাঁ বললে, 'কাল নিয়ে যাব তোমাদের। কালকে তোমাদের ভোটের দিন।'

সুন্দর খাঁর মুখে এততেও কোনো দ্বেষ-দুঃখ নেই। জোনাবালির একখানা জমি নিতে পারেনি তো কী হয়েছে, বাদশাহি এলে কত জমি সে জায়গীর খাবে।

কিন্তু আধমাঠের ধান ফেলে রেখে যাবে কি করে কাল? রাখ, রাখ। এক দিনেই আর ধান চুরি যাবে না। গেলে যাবে, তাই বলে ভোট দেবে না সে? আগন্তুক শুভদিনের সংবর্ধনায় সে তার সম্মতি জানিয়ে রাখবে না?

ধানকাটা শেষ না করেই জোনাবালি শহরে চলল। লুঙ্গি আর ছেঁড়া একটা কুর্তা। কাঁধের উপরে শুকনো একখানা গামছা।

সে একা নয়, নৌকায় আরো অনেক সোয়ারী। পান-তামুক খেতে দিয়েছে, ফেরবার পথে খেতে দেবে শহরের রসগোল্লা।

শেষ পর্য্যন্ত যে জায়গায় তারা এসে পৌঁছুলো সে একটা মাঠের মাঝখানে টিনের বেড়ার ইস্কুল-ঘর। চারদিকে ভাঙা হাটের গোলমাল। যেমন ভিড় তেমনি হৈ-হল্লা। এ হাত ধরে টানে, ও হাত ধরে টানে। এ কানের কাছে চেঁচায়, ও কানের কাছে চেঁচায়। মাথা খারাপ হয়ে যাবার দাখিল।

পাটোয়ার সুন্দর খাঁ সঙ্গে আছে বলেই রক্ষে। সে দল-কে-দল নিয়ে গেল লতিফ সরদারের আস্তানায়। তাদেরকে এক-এক করে কাগজের টুকরোতে ইউনিয়নের নম্বর ও ভোটারের নম্বর টুকে দেবে। তা নিয়ে যাবে তারা ভোটের ঘরে। কাগজ দেখাবে বাবুদের। ছাপানো নাম পরখ করে দেখে ঠিক হলে ভোটের কাগজ দেবে পিঠে

ছাপ মেরে। সে-কাগজ নিয়ে ঢুকবে শেষে পর্দা-ঘেরা কোণের খোপে। সেখানে গিয়ে ভোট দেবে।

ভোট কি করে দিতে হয় জানো তো?

কি করে?

যাকে ভোট দেবে তার নামের পাশে পেন্সিল দিয়ে চিকে মারবে। দেখো ঘরের লাইন যেন ডিঙিয়ে যেও না।

'আমি যে হুজুর পড়তে পারব না।' জোনাবালি ডুকরে ওঠে।

ভয় নেই, ভোটের হাকিমকে বললেই ঠিক জায়গায় চিকে দিয়ে দেবে।

এত গোলমাল, সকল কথা ভাল করে বুঝতে পারে না জোনাবালি। ও সব চিকে-ফিকের মামলায় কী দরকার? হাত তুললে হয় না?

'তারপর? চিকে কাটা হয়ে গেলে?'

একটা ডাক-বাক্স আছে, তাতে ফেলে দেবে ঐ ভোটের কাগজ। এবার লড়াই শুধু দুজনের মধ্যে বলে বাক্স মোটে একটা। এবার বিশেষ হাঙ্গামা নেই। পরের বারে ভোটের বেলায় ছাতা-লণ্ঠন গাড়ি-গরু দেখতে পাবে অনেক।

পরের বার পর্যন্ত বাঁচবার সাধ নেই জোনাবালির। এবারেই যেন সে দিনের নাগাল পায়।

'আরেকবার বুঝিয়ে বলো।' জোনাবালি শাদা মুখে তাকিয়ে থাকে।

কিছু ভয় নেই। একেবারে সোজা। ঘরের মধ্যে ঢুকলেই বুঝিয়ে দেবে বাবুরা। ওখানে আমাদের এজেন্ট, গোমস্তা আছে। এই নাও চিরকুট।

কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে ভিড় ঠেলে ভয়ে-ভয়ে ঢুকল জোনাবালি।

এজেণ্ট সনাক্ত করলে। কাগজের টুকরোতে নম্বর দেখে ভোটারের লিষ্টিতে নাম বেরুল। জোনাবালি মৃধা, বাপের নাম জিন্নাতালি মৃধা।

'হু বাবু, আমার নাম।'

কলের মধ্যে থেকে চাপ দিয়ে পিঠে ছবি ফুটিয়ে ভোটের টিকিট জোনাবালির হাতে দিল। আমলাবাবু জিগেস করলে, 'লেখাপড়া জানো?'

'না বাবু।'

'তবে যাও ঐ হাকিমের কাছে।'

ভয়ে-ভয়ে এগুলো জোনাবালি।

হাকিম তাকে নিয়ে গেল একটা ঘুপসি মতন ঘরের মধ্যে। সবই ভারি তাজ্জব লাগছে জোনাবালির। তার এত হিম্মত? তার হয়ে হাকিম নিজে তার আর্জি মুসাবিদা করে দেবে? খোদার কাছে জানাবে তার ফরিয়াদ?

'কাকে ভোট দেবে?' মাথা নিচু করে কানের কাছে মুখ এনে হাকিম তাকে চুপি চুপি জিগগেস করেন।

মুহূর্তে কিরকম গুলিয়ে যায় জোনাবালির। তালগোল পাকিয়ে যায়। বুকের মধ্যে টিপটিপ সুরু হয়।

'বড় গোলমাল হুজুর। মাথা ঘুরে যাচ্ছে।'

'কতক্ষণ আর! বলো, কাকে ভোট দেবে?'

ঢোক গিলে ইতি-উতি তাকাতে লাগল জোনাবালি। বন্ধ ঘর, কারু থেকে কোনো ইশারা পাবার আশা নেই। অনেকক্ষণ পরে যন্ত্রণা-

আঁকা মুখে সে বললে. 'যাকে সবাই দিচ্ছে তাকে।'

'বা, কাকে কে দিচ্ছে তা আমি জানব কি করে? তুমি বলো তার নাম।'

'নাম আমার মনে নেই।' অন্ধকার মুখে বললে জোনাবালি।

'নাম মনে নেই তো আমি বলে দিচ্ছি। দুজন আছে। এক হানিফ শিকদার, দুই লতিফ সরদার। কাকে ভোট দেবে নাম বলো, আমি তোমার হয়ে দাগ দিয়ে দিচ্ছি।'

যাক, নাম শুনে ধড়ে প্রাণ এল জোনাবালির। আসান পেল। নইলে সব যাচ্ছিল ভরাডুবি হয়ে। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'হানিফ শিকদার।'

হাকিম চিকে কাটল। বললে, 'এবার এটা ঐ বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে যাও ঐ দরজা দিয়ে। খবরদার, কাউকে বলো না কাকে ভোট দিয়েছ। যে বলবে তার জেল হয়ে যাবে।'

এই চিঠির বাক্সে করে চিঠি যাবে বুঝি মহারাণীর কাছে। কিংবা, কে জানে, হয়তে এই নালিশ পৌঁছুবে গিয়ে খোদ খোদার এজলাসে। দিন ফিরবে এত দিনে।

'কাকে ভোট দিলে?' ঘর থেকে বেরুতেই ধরল তাকে সুন্দর খাঁ: 'কি, লতিফ সরদারকে দিয়েছ তো?'

ধরল মেহেরালি, তার বাড়ির ধারের পড়শী: 'কি, লতিফ সরদারকে ভোট দিয়েছিস তো?'

ধরল হোসেন পেয়াদা। ধরল আতাহার।

কথা না বলিয়ে ছাড়বে না জোনাবালিকে। জোনাবালি বললে

'নাম বলতে হাকিম বারণ করে দিয়েছে। যে বলবে তার জেল হয়ে যাবে।'

জোনাবালির মনে সুখ নেই, তার গাঙে ডুবে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। তার সুখের দিনের সে কবর খুঁড়েছে নিজের হাতে।

বললে, 'তোরা এগো, আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে। হুপ করে জ্বর এসে যাবে বুঝি।'

নৌকাতে সবাই রসগোল্লা খেল, জোনাবালি বললে, দরদ হয়েছে পেটে। সবাই হৈ-হল্লা করছে, আর সে বসে আছে গোমসা মুখে। হাত-ফিরতি হুঁকো টানছে সবাই, তার কলকেতে আগুন নেই। মাঠে গিয়ে বাদবাকি ধান কাটে, মনে হয় তার কাঁচির ছোঁয়াচ লেগে ধান যেন আগাছা হয়ে গেছে। হালিমের মার দিকে তাকায়, তার শাড়ির ছেঁড়াটা মাথা ছেড়ে পিঠের দিকে নেমে এসেছে।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাসও বুঝি ঘুরে আসে, নতুন বাদসাহি আর আসে না। এ যে তারই কৃতকর্মের ফল তাতে আর সন্দেহ কি।

এক দিন দুঃখের কথা বলে হালিমের মাকে।

বলে, 'ভূত চেপেছিল কাঁধে, কি রকম ভুল হয়ে গেল। আর আমারই ভুলের জন্যে দিন আর বুঝি ফিরল না, হালিমের মা।'

হালিমের মা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কতক্ষণ। শেষে বলে, 'ঐ বাক্সে কত রাজ্যের কাগজই তো পড়েছে। তোমার কাগজ ওরা টের পাবে কি করে? তুমিতো আর ওতে হাতের টিপ দিয়ে দাওনি। কি করে ওরা তোমার ভুল ধরবে শুনি?'

ওরা ধরতে পারবে না, না পারুক, কিন্তু তাতে জোনাবালির সান্ত্বনা কই? খোদা তো জানতে পেরেছেন। তিনি তো জেনে

গিয়েছেন যে জোনাবালি নতুন বাদশাহি চায় না। চায়না সুদিনের সূর্য।

হালিমের মার বুকের কাছে মুখ রেখে অস্ফুট গলায় কাঁদে জোনাবালি।

কিন্তু বৃথাই জোনাবালি কাঁদছে। খবর এল, লতিফ সরদারই ভোটে জিতেছে।

'বলিনি তখন? খোদাতালা কি মনের কথা না শুনে পারেন?' হালিমের মা আহ্লাদে ফেটে পড়তে লাগল: 'পীরের দুয়ারে গিয়ে সিন্নি দেব এবার।'

জোনাবালি দম বন্ধ করে বসে ছিল এ কদিন। আল্লার কাছে কেবল মাপ চেয়ে বেড়িয়েছে। তার পাপের কি আর শেষ ছিল? উমি লোক, লেখা-পড়া শেখেনি, সব কেবল অস্মরণ হয়ে যায়, তার উপরে গলৎকুষ্ঠ গরিব, তার অপরাধের ইতি-অন্ত ছিল না। কিন্তু ফকির-ফতুরের মালিক যিনি তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন।

এবার দিকে-দিকে বসে যাবে দৌলতখানা।

কিন্তু কোথায় কাপড়! কোথায় কেরাসিন! কোথায় ওষুধ-বিষুধ!

দুয়ারে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে আদালতের পেয়াদা। নিশানদিহি করেছে সুন্দর খাঁ।

কি ব্যাপার?

পরবর্তী কালের খাজনার জন্যে সুন্দর খাঁ দস্তক করেছে।

সে কি কথা? শুনেছিলাম না দেনদারের শরীর আর দায়ী হবে না? উঠে গেছে গ্রেপ্তার?

হ্যাঁ, সে যাদের খত-তমশুকের দেনা। বাকি-ফেলার ফাঁকিদার রায়ত-কোলরায়ত নয়। খাজনা-আদায়ের মোক্ষম অস্ত্র হাতছাড়া হয়নি জমিদারের। খাজনা না দেয়া চুরি-ডাকাতির সমান।

পেয়াদার জিম্মা হয়ে জোনাবালি চলল আদালতে।

বললে, 'হালিমের মা, জেলটা একবার ঘুরে আসি। আমাদের নতুন দিন বুঝি ঐখানেই আটকা পড়ে আছে।'



নুরবানু

কুরমান হাটে কাঁচের চুড়ি কিনতে এসেছে।

মেজাজ খুব খারাপ। গা এখনো কশ-কশ করছে। তবু এ-দোকান থেকে ও-দোকানে সে ঘোরাঘুরি করে। সোনালি কিনবে না বেগুনি কিনবে চট করে ঠাহর করতে পারে না।

অন্যদিন হাটে এসে তামাক কিনত, লঙ্কা-পেঁয়াজ কিনত, তিতপুঁটি বা ঘুসো চিংড়ি। আজ তাকে কাঁচের চুড়ি কিনতে হচ্ছে। কিনতে হচ্ছে চুলের ফিতে।

চুড়ির সোয়া তিন আঙুল জোখা। চুড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখে কুরমান। জোখা মেলে তো রং পছন্দ হয় না, রং মনে ধরে তো জোখায় গরমিল।

নুরবানুর কাঁচেব চুড়ি সে আজ ভেঙে দিয়ে এসেছে। ফিতে ধরে টানতে গিয়ে খুলে দিয়েছে চুলের খোঁপা। চোট-জখম লেগেছে হয়তো এখানে-ওখানে।

জমি-জায়গা নেই, কর-কবুলত নেই, বর্গায় চাষ করে কুরমান। তাও লাঙল কিনে আনতে হয় পরের থেকে। ধান যা-ও হয়েছিল গত সন, পাখিতে খেয়ে নিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে ইঁদুরে। এ-বছর গাছ হয়েছে তো শিষ হয়নি। ডোবা জমি, নোনা কাটে না ভাল

করে। যা ধান হয়েছে দলামলা করে মনিবের খাস খামারে তুলে দিয়ে আসতে হবে। সে পাবে মোটে তিন ভাগের এক ভাগ।

বড় দুর্বল অবস্থা তাদের। না আছে থান না আছে থিত। তাই কুরমানের একার খাটনিতে চলে না। নুরবানুকেও কাজ করতে হয়।

নুরবানু মনিবের বাড়িতে ধান ভানে, পাট গুটোয়, কাঁথা-কাপড় কাচে, জল টানে। আর মনিব-গিন্নির খেজমৎ করে। চুল বাছে, গা খোঁটে, তেল মাখে। ভাল-মন্দ খেতে পায় মাঝে মাঝে। দরমা পায় চার টাকা।

কিন্তু শান্তি নেই। মনিব, উকিলদ্দি দফাদার, নুরবানুকে অন্যায় চোখে দেখেছে!

প্রথম দিনেই নালিশ করেছিল নুরবানু ঃ 'মুনিব আমাকে অন্যায় চোখে দেখে।'

'কেন, কি করে?'

'খুক-খুক করে কাশে, বাঁকা চোখে তাকায়, আমোদ-সামোদ করে কথা কয়।'

'তুই ওর ধারাধারি যাসনে কোনোদিন।'

'না, আমি ঘোমটা টেনে চলে যাই দুর দিয়ে।'

কিন্তু দফাদার তাতে ক্ষান্ত হয় নি। একদিন নুরবানুর হাত চেপে ধরল।

সেদিন কাঁদতে-কাঁদতে নুরবানু বললে, 'হাত ছাড়িয়ে নেবার সময়ে খামচে দিয়েছে।'

রাগে শরীরের রগগুলো টান হয়ে উঠল কুরমানের। বললে, 'তুই সামনে গেছিলি কেন?'

'কে বললে? যাইনি তো সামনে।'

'সামনে যাসনি তো হাত চেপে ধরে কি করে?'

'আমি ছিলাম ঢেঁকি-ঘরে। ও ঘরে ঢুকে বললে, বীজ আছে ক কাটি? আমি পালিয়ে যাচ্ছি পাছ-দুয়ার দিয়ে, ও খপ করে আমার হাত চেপে ধরল।'

তবু সেদিনও সে মারেনি নুরবানুকে। নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দিয়েছিল।

আশ্চর্য, গরিবের বউএর-কি একটু ছুরংও থাকতে-পারবে না? গরিব বলে স্ত্রীর বেলায়ও কি তাদের অনুভব আর উপভোগের মাত্রাটা নামিয়ে আনতে হবে?

'খবরদার, সামনে যাবি না ওর। ওরা জোরমস্ত লোক, থানা-পুলিশ সব ওদের হাতে, ওদের অনেক দূর দিয়ে আমাদের হাঁটা-চলা। কাজ-কাম সেরে ঝপ করে চলে আসবি।'

কিন্তু আজ ওর হাত-ভরা কাঁচের চুড়ি। ফিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিনুনি পাকানো।

হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল নুরবানু, কুরমানের মুখের চেহারা দেখে ঝিম মেরে গেল।

'এসব কোত্থেকে?'

'মুনিবগিন্নি দিয়েছে।'

কিন্তু, জিগগেস করি, পয়সা কার? এ সাজানোর পিছনে কার চোখের সায় রয়েছে লুকিয়ে? আজ কাঁচের চুড়ি, কাল আংটি-চুংটি।

নোনা জমি এমনি করেই আস্তে আস্তে মিঠেন করে তুলবে। হাত ধরেছিল, ধরবে এবার গলা জড়িয়ে।

'খুলে ফ্যাল শিগগির।' গর্জে উঠল কুরমান।

সাজবার ভারি সখ নুরবানুর। একটু সে হয়তো টালমাটাল করেছিল, কুরমান হাত ধরে হেঁচকা টান মারল। পটপট করে ভেঙে গেল কতগুলি। হেঁচকা টান মারল খোঁপায়। একটা কুণ্ডলী-পাকানো সাপ কিলবিল করে উঠল।

ডুকরে কেঁদে উঠল নুরবানু। চুড়ির ধারে জায়গায়-জায়গায় হাত কেটে গিয়েছে। চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে রক্ত।

ঘরের পুরুষের এমন দুর্দান্ত চেহারা দেখেনি সে আর কোনো দিন। বাবা, ভয় করে। দরকার নেই তার চুড়ি-খাড়ুতে। কিষানের বউ সে, ঠুঁটো পাথর হয়ে থাকবে। সাধ-আমোদে তার দরকার কি।

কিন্তু এ কি! হাটের থেকে তার জন্যে চুড়ি নিয়ে এসেছে কুরমান। লঙ্কা-পেঁয়াজ তামাক-টিকে না এনে। লজ্জায় গলে যেতে লাগল নুরবানু।

পাঁচ আঙুলের মুখ একসঙ্গে সুঁচলো করে চেপে ধরে কুরমান। টিপে-টিপে আস্তে-আস্তে চুড়ি পরিয়ে দেয়। হঠাৎ রাগে রগ ছিঁড়ে গিয়েছিল তার। নইলে এমন যার তুকতুকে হাত তার গায়ে সে হাত তোলে কি করে?

'তুমি কেন মিছিমিছি বাজে খরচ করতে গেলে? এদিকে তোমার একটা ভাল গামছা নেই, লুঙ্গিটা ছিঁড়ে গেছে।'

'যাক সব ছিঁড়ে-ফেড়ে। তুই শুধু একবারটি হাস আমার মুখের দিকে চেয়ে।'

পিঠে চুলগুলি খোলা পড়ে আছে ভুর করে।

'তোর চুল বাঁধা দেখিনি কোনো দিন—'

আজ শুধু দেখে না কুরমান, শোনেও। শোনে চুল বাঁধার সঙ্গে-সঙ্গে চুড়ির ঠুন-ঠুন।

উকিলদ্দির বাড়িতে তবু না গেলেই নয় নুরবানুর। চারটে টাকা কি কম? কম কি একবেলার খোরাকি? ধান-পান যদি পায় ভবিষ্যৎ, তাই কি অগ্রাহ্য করবার?

কিন্তু সেদিন নুরবানু উকিলদ্দির বাড়ি থেকে নতুন শাড়ি পরে এল। ফলসা রঙের শাড়ি। নুরবানুর বর্ণ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

'এ শাড়ি এল কোত্থেকে?' বর্শার মুখের মত চোখা হয়ে উঠল কুরমান।

'আজ যে ঈদ খেয়াল নেই তোমার? ঈদের দিনে মুনিব-গিন্নি দিয়েছে শাড়িখানা।'

ঈদের দিন হলেও নরম পড়ল না কুরমান। ফিরনি-পায়েসের ছিঁটে ফোঁটাও নেই, নতুন একখানা গামছা হয় না, ঈদ কোথায়?

না, নরম পড়ল না কুরমান। শাড়ির প্রত্যেকটি সুতোয় দেখতে পাচ্ছে সে উকিলদ্দির ঘোলা চোখ, ঘসা জিভ। ফাঁই-ফাঁই করে শাড়িটা সে ছিঁড়ে ফেলল।

এবার আর সে হাটে গেল না পালটা শাড়ি কিনে আনতে। পয়সা নেই, ইচ্ছেও নেই। ক্ষুদ্দুর চাষা, তার বউয়ের আবার সাইবানী হবার সখ কেন? চট মুড়ি দিয়ে থাকতে পারে না সে ঘরের কোণে?

সত্যি, এত সাজ তার পক্ষে অসাজন্ত ছিল। বুঝতে দেরি হয় না নুরবানুর। কিন্তু তখন কি সে বুঝতে পেরেছে শাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে

সাপ রয়েছে লুকিয়ে ? গা বেয়ে বেয়ে শেষ কালে বুকের মধ্যে ছোবল মারবে ? নুরবানু তার কালো ফুলের ছাপ-মারা কালো শাড়িই পরে এবার। তার রাতের এ নিরিবিলি শান্তির মতই এ শাড়িখানা। তাই ঘুমের স্রোতে স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারে সে স্বামীর স্পর্শের ঘেরের মধ্যে। ফলসা রঙের শাড়িটার জন্যে তার এতটুকুও কষ্ট নেই।

কুরমান কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনল নুরবানুকে। নিয়ে এল পর্দার হেপাজতে। উপাসে-তিয়াসে কাটবে, তবু পাপের পথের পাশ দিয়ে হাঁটবে না। দারিদ্র্য লাগুক গায়ে, তবু অধর্ম যেন না লাগে। অদিন এলেও যেন না অমানুষ বনে যায়।

কিন্তু উকিলদ্দি ছিনে-জোঁক। বয়স হয়েছে কিন্তু বিবেচনা নেই।

ধান কাটতে মাঠে গেছে কুরমান। লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটবার দিন এখন। পা টিপে-টিপে দুপুর বেলা উকিলদ্দি এসে হাজির। কানের জন্যে ঝুমকো, পায়ের জন্যে পঞ্চম, গলার জন্যে দানাকবজ নিয়ে এসেছে গড়িয়ে।

বললে, 'কই গো বিবিজান। দেখ এসে কী এনেছি ?'

বেরিয়ে আসতেই নুরবানুর চক্ষু স্থির। রুপোর জেওর দেখে নয়, চোখের উপরে বাঘ দেখে।

অনেক ভয়-ডর নুরবানুর। এক নম্বর মালেক, দুই নম্বর মুনিব। তিন নম্বর দফাদার। চার নম্বর একটা মাংসখেকো জানোয়ার।

'চলে যান এখান থেকে।' চোখে মুখে আঁচ ফুটিয়ে ঝাপসা গলায় বললে নুরবানু।

'তোমার জন্যে লবেজান হয়ে আছি। এই দেখ, জেওর এনেছি গড়িয়ে।'

'দরকার নেই। আপনি চলে যান। নইলে সোর তুলব এখুনি।'

কিন্তু সোর তুলবার আগেই কুরমান এসে হাজির।

রোদে সে তেতে-পুড়ে এসেছে, চোখে ঘোলা পড়েছে বোধ হয়। নইলে দেখছে সে কী তার বাড়ির উঠোনে? উকিলদ্দির হাতে রুপোর গয়না আর নুরবানুর চোখে খুসির ঝলকানি। কত না জানি ঠাট্টা-বটখেরা, কত না জানি হাসির বুজরুকি। রং-সং, আমোদ-বিনোদ। এই গয়নাতে কতো না-জানি যোগসাজসের সর্ত।

মাথায় খুন চেপে গেল কুরমানের। চার পাশে চেয়ে দেখল সে অসহায়ের মত। দেখল ধানের আঁটির সঙ্গে কাঁচি সে ফেলে এসেছে মাঠে।

'এখানে কেন?'

ধানাই-পানাই করতে লাগল উকিলদ্দি। শেষ কালে বললে, 'লক্ষ্মী-বিলাস ধান কাটতে গিয়েছিস কি না দেখতে এসেছিলাম।'

'তা মাঠে না গিয়ে আমার বাড়ির অন্দরে কেন?'

'বেশ করেছি। সমস্ত জায়গা-জমি সদর-অন্দর আমার। আমার যেখানে খুশি আমি যাব আসব।'

কুরমান হঠাৎ উকিলদ্দির দাড়ি চেপে ধরল। লাগল ঝটাপটি, ধস্তাধস্তি। উকিলদ্দির হাতে যে লাঠি ছিল দেখেনি কুরমান। তা ছাড়া কুরমান আধপেটা খাওয়া চাষা, জোর-জেল্লা নেই শরীরে, সেটাও সে বিচার করে দেখেনি। উকিলদ্দি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে তো দিলই, তুলে নিল লাঠিগাছটা।

কুরমানকে দেখেই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল নুরবানু। এখন মারমুখো লাঠি দেখে বেরিয়ে এল সে হস্ত-দস্ত হয়ে, শিকরে-পাখির

মত ঝাঁপিয়ে পড়ল উকিলদ্দির উপর। লাঠিটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল জোর করে। মুঠো আলগা করতে পারে না, শুধু সুরু হয় লাটপাট।

কি চোখে দেখল ব্যাপারটা কে জানে, কুরমানের রক্তের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল। এক ঝটকায় টেনে আনতে গেল নুরবানুকে চুলের ঝুঁটি ধরে: 'তুই, তুই কেন বেরিয়ে এসেছিস পর্দার বাইরে? কেন পর-পুরুষের সঙ্গে জাপটাজাপটি সুরু করে দিয়েছিস?' উকিলদ্দিকে রেখে মারতে গেল সে নুরবানুকে।

আর, যেমনি এল এগিয়ে, হাতের নাগালের মধ্যে, অমনি উকিলদ্দির লাঠি পড়ল কুরমানের মাথায়। মনে হল নুরবানুই যেন লাঠি মারলে। মনে হল কুরমানের মারের থেকে উকিলদ্দিকে বাঁচাবার জন্যেই তার এই জোটপাট। উকিলদ্দির গায়ে পড়ে তাই এত সাধ্য-সাধনা।

কুরমান দিশেহারার মত চেঁচিয়ে উঠল: 'এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক—বাইন।'

ব্যস, উথল-পাথল বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। সব নিশ্চুপ, নিঃশেষ হ'য়ে গেল।

রাগ ভুলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল কুরমান। হাজার লাঠি পড়লেও এমন চোট লাগত না। আঁধার দেখতে লাগল চারদিক। নুরবানুর সেই রাগরাঙা মুখ ফুসমন্তরে ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। ফকির-ফতুরের মত তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে। আর মাটি থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে চাপা সুখে হাসতে লাগল উকিলদ্দি।

লোক জমতে সুরু করল আস্তে আস্তে।

কুরমান গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। বললে নুরবানুকে, 'ও কিছু হয়নি, তুই চলে যা ঘরের মধ্যে।'

সত্যিই যেন কিছু হয়নি এমনি ভাবেই আঁচল গুটিয়ে নুরবানু চলে গেল ঘরের মধ্যে, ঘরের বউএর মত।

কিছু হয়নি বললেই আর হয় না। আস্তে আস্তে বসে গেল দশ-সালিশ। তালাক-দেওয়া স্ত্রী এখন আলগা-আলগোছ মেয়েলোক। তার উপর আর পূর্ব স্বামীর এক্তিয়ার নেই। এক কথায় অমনি আর তাকে সে ঘরে তুলতে পারে না। বিয়ে ফস্ত হয়ে গেছে, অমনি আর তাকে নেয়া যায় না ফিরতি। অমন হারামি সমাজ বরদাস্ত করতে পারবে না।

উকিলদ্দি দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

'রাগের মাথায় ফস করে কথা বেরিয়ে গেছে মুখের থেকে, অমনি আমার ইস্ত্রী পর হয়ে যাবে?' কুরমান কেঁদে উঠল।

পর বলে পর! এপার থেকে ওপার! একবার যখন বিয়ে ছাড়ার ফারখৎ জারি করেছে তখন আর উপায় নেই। ঘুড়ি কাটা পড়লে নাটাই গুটিয়ে কি ঘুড়িকে ধরে আনা যায়?

'মুখের কথাটাই বড় হবে? মন দেখবে না কেউ?'

মুখের জবানের দাম কি কম? রং-তামাসা করে বললেও তালাক তালাক। আর এ তো জল-জীয়ন্ত রাগের কথা। গলা দরাজ করে দিনে-দুপুরে তালাক দেওয়া।

'আর দস্তুরমত সাক্ষী রেখে।' ফোড়ন দিল উকিলদ্দি।

'এখন উপায়? নুরবানুকে আমি ফিরে পাব না?'

এক উপায় আছে। দশ-সালিশ বসল ফরমান দিতে। ইদ্দতের পর কেউ যদি নুরবানুকে বিয়ে করে তালাক দেয় তবেই ফের কুরমান নিকে করতে পারে তাকে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

কে বিয়ে করবে? কুরমানকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে কে বিয়ে করবে নুরবানুকে? আর কে! দাড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে উকিলদ্দি বললে, 'আমি বিয়ে করব।'

কিন্তু বিয়ে করেই তক্ষুনি-তক্ষুনি তালাক দিতে হবে। কথার খেলাপ করলে চলবে না। দশ-সালিশের হুকুম মানতে হবে। এর মধ্যে আছে খাদেম-ইমাম, মোল্লা-মুনসি, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মানী-গুণী লোক সব। এদেরকে অমান্য করা যাবে না।

একটু যেন বল পেল কুরমান। কিন্তু তার বাড়িতে থাকতে পারবেনা আর নুরবানু। বিরানা পর-পুরুষের ঘরে কি করে থাকতে পারে সমর্থ বয়সের মেয়েছেলে? পাশ-গাঁয়ে তার এক চাচা আছে, বেচারী নাচার, সেখানে সে থাকবে। ইদ্দতের তিন মাস।

এক কাপড়ে কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল নুরবানু। যেন কুরমানকে গোর দেওয়া হয়েছে। পুঁতে রেখেছে মাটির নিচে।

তা ছাড়া আর কি? কুরমানের হাতের নাগালির মধ্য দিয়ে চলে গেল, তবু হাত বাড়িয়ে তাকে সে ধরে রাখতে পারল না।

সামান্য কটা মুখের কথা এমনি করে সব নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে এ কে জানত! কুরমানের নিজের রাগ নিজেকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।

দাউলে হয়ে কুরমান চলে গেল দক্ষিণে। নুরবানু ছাড়া তার আর ঘর-দুয়ার কি! ঘরের উইয়ে-খাওয়া পাটখড়ির বেড়া ভেঙে-ভেঙে

পড়ছে, তেমনি ভেঙে-ভেঙে পড়ছে তার বুকের পাঁজরা। চলে গেছে দক্ষিণে, কিন্তু মন কেবল উত্তরে ভেসে-ভেসে বেড়ায়।

ধান কাটা সারা হয়ে গেছে, নিজের গাঁয়ে ফিরে আসে কুরমান। গাঁয়ের হালট ধরে নিজের বাড়িতে। ঘরের ঝাপ খোলে। কোথায় নুরবানু! চৈতী মাঠের মত বুকের ভিতরটা খাঁ-খা করে। কিন্তু রাত করে লুকিয়ে একদিন আসে নুরবানু। যেন খুব একটা অন্যায় করেছে এমনি চেহারায়। কুরমানের থেকে অনেক দূরে সরে বসে আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদে।

কুরমান বুঝি ঝাঁপিয়ে ধরতে চায় নুরবানুকে। ইচ্ছে করে কোলের কাছে বসিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে দেয়।

নুরবানু বলে, 'না। এখনো হালাল হইনি। ইদ্দত কাবার হয়নি। হয়নি ফিরতি বিয়ে, ফিরতি তালাক।'

বলে, 'তোমাকে শুধু একটিবার দেখতে এলাম। বড় মন কেমন করে।'

বড় কাহিল হয়ে গেছে নুরবানু। বড় মন-মরা। গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে। জোর-জলুস মুছে গেছে গা থেকে।

এটা-ওটা একটু-আধটু গোছগাছ করে দেয় নুরবানু। ঘরের মধ্যে নড়ে-চড়ে।

'তোকে কি আর ফিরে পাব নুরু?'

'নিশ্চয়ই পাবে। দশ-সালিশের বৈঠকে চুক্তি হয়েছে, কড়ায় ক্রান্তিতে সব আদায়-উশুল হয়ে যাবে। চোখ বুজে এক ডুবে মাঝখানের এই কয়েকটা দিন শুধু কাটিয়ে দেয়া।'

'আমার কি মনে হয়ে জানিস? ও তোকে আর ছাড়বে না।

একবার কলমা পড়া হয়ে গেলেই ও ওর মুখে কুলুপ এঁটে দেবে। বলবে, দেব না তালাক।'

'ইস?' নুরবানু ফণা তুলে ফোঁস করে উঠল: 'দশ-সালিশ ওকে ছাড়বে কেন?'

'না ছাড়লেই বা কি, ও পষ্ট গরকবুল করবে। এ নিয়ে তো আর আদালত চলবে না। বলবে, কার সাধ্য জোর করে আমাকে দিয়ে তালাক দেওয়ায়?'

'ইস্, করুক দেখি তো এমন বেইমানি!' আবার ফোঁস করে ওঠে নুরবানু: 'বেতমিজকে তখন বিষ খাইয়ে শেষ করব। ওর বিষয়ের অংশ নিয়ে এসে সাদি করব তোমাকে।'

নুরবানুর চোখে কত বিশ্বাস আর স্নেহ।

'গা-টা তেতো-তেতো করছে, জ্বর হবে বোধ হয়।'

গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল নুরবানু। হাত গুটিয়ে নিল ঝট করে। অমন সোনার অঙ্গ স্পর্শ করার তার অধিকার নেই।

একেক দিন গহিন রাতে কুরমান যায় নুরবানুর ঘরের দরজায়। নুরবানুর চোখে ঘুম নেই। বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে বসে থাকে।

বলে, 'কেন পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ? লোকে যে চোর বলবে। চৌকিদার দেখলে চালান দেবে।'

'কবে আসবি?'

'দফাদার লোক নিয়ে এসেছিল। আসছে জুম্মাবার কলমা পড়বে। তার পরেই তালাক আদায় করে নেব ঠিক। এখন বাড়ি যাও।'

কোথায় বাড়ি! কুরমানের ইচ্ছে করে পাখিটাকে বুকের উমে করে উড়াল দিয়ে চলে যায় কোথাও! কোথায় তা কে জানে?

যেখানে এত প্যাঁচঘোঁচ নেই, যেখানে শুধু দেদার মাঠ আর দেদার আসমান।

শিগগির বাড়ি যাও। কুরমান চোর। কুরমান পরপুরুষ।

জুম্মাবারে বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু, কই, শনিবার তো তালাক নিয়ে চলে এল না নুরবানু।

যা সে ভেবে রেখেছে তাই হবে। একবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে উকিলদ্দি আর ছেড়ে দেবেনা নুরবানুকে। গলা টিপে ধরলেও তার মুখ থেকে বার করানো যাবে না ঐ তিন অক্ষরের তিন কথা। বলবে, মরণ ছাড়া আর কারুর সাধ্য নেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। কুরমান খোঁজ নিতে গেল। দাবিদারের মত নয়, দেনদারের মত।

উকিলদ্দি বললে, 'আমার কোনো কসুর নেই। বিয়ে হয়েছে তবু নুরবানু এখনো ইস্ত্রী হচ্ছে না। ইস্ত্রী না হলে তালাক হয় কি করে?'

যত সব ফাঁকিজুঁকি কথা। তার আসল মতলব হচ্ছে নুরবানুকে রেখে দেবে কবজার মধ্যে। রাখবে অষ্টঘড়ির বাঁদি করে।

কুরমান দশ-সালিশ বসাল। জানাল তার ফরিয়াদ।

ডাক উকিলদ্দিকে। জবাব কি তার? কেন এখনো ছাড়ছে না নুরবানুকে? কেন এজাহার খেলাপ করছে?

উকিলদ্দি বললে, বিয়েই যে এখনো সিদ্ধ হয়নি, ফলন্ত-পাকান্ত হয়নি। এখনো মাটির গাঁথনিই আছে, হয়নি পাকা-পোক্ত। বিয়ে হয়েছে অথচ এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে নুরবানু। ধরা-ছোঁয়া দিচ্ছে না। শুতে আসছে না দরজায় খিল দিয়ে। ও ভেবেছে কলমা

পড়ার পরেই বুঝি ও তালাকের কাবিল হল। তাই রয়েছে অমন কাঠ হয়ে, বিমুখ হয়ে। এমনি যদি থাকে, তবে কাঁটান-ছিঁড়েন হতে পারে কি করে ?

সত্যিই তো। দশ-সালিশ রায় দিলে। স্বামীর সঙ্গে একরাত্রিও যদি সংসার না করে তবে বিয়ে জায়েজ হয় কি করে ? বিয়ে পোক্ত না হলে তালাক চলে না। হালাল হওয়া চলে না নুরবানুর।

উপায় নেই, হালাল হতে হবে নুরবানুকে। তালাক মেনে নিতে হবে ভিক্ষুকের মত।

ঘরে ঢুকে দরজার খিল দিল নুরবানু।

পর দিন ভোরে পাখিপাখলা ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই উকিলদ্দি নুরবানুকে তালাক দিল।

বিকেলের রোদ উঠোনটুকু থেকে যাই-যাই করছে, নুরবানু চলে এল কুরমানের বাড়িতে। কুরমান বসে আছে দাওয়ার উপর। হাতের মধ্যে হুঁকো ধরা, কিন্তু কলকেতে আগুন নেই। কখন যে নিবে গেছে তা কে জানে। চেয়ে আছে—শুনা মাঠের মত চাউনি। গায়ের বাঁধন সব ঢিলে হয়ে গেছে, ধস ভেঙে পড়েছে জীবনের। ভাঙন-নদীর পারে ছাড়া-বাড়ির মত চেহারা।

যেন চিনি অথচ চিনি না, এমনি চোখে কুরমান তাকাল নুরবানুর দিকে। তার চোখে গত রাতের সুর্মা টানা, ঠোঁটে পান-খাওয়ার শুকনো দাগ। সমস্ত গায়ে যেন ফুর্তির আতর মাখা। পরনে একটা জামরঙের নতুন শাড়ি। পরলে-পরলে যেন খুশির জলের স্রোত।

সে জল বড় ঘোলা। লেগেছে কাদা-মাটির ময়লা। পচা দামের জঞ্জাল। মড়ার মাংসের গন্ধ।

সে জলে আর স্নান করা যায় না।

'ইদ্দত আমি এখানেই কাবার করব। দিন হলেই মোল্লা ডেকে কলমা পড়িয়ে নাও তাড়াতাড়ি।' নুরবানু ঘরের দিকে পা বাড়াল।

নেবা হুঁকোয় টান মারতে মারতে কুরমান বললে, 'না। আমার নিকে-সাদিতে আর মন নেই। তুই ফিরে যা দফাদারের বাড়িতে।'



অপরাধ

কে পিছু নিয়েছে। দিনেশ দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল।

গিয়েছিল পাশ-গ্রামে, খেজুরতলায়। অজয়কে দেখতে। অজয় ডেটিনিউ। অন্তরীণ।

তবে কি পুলিশ পিছু নিয়েছে?

বা, দেখা করার তার অনুমতি-পত্র ছিল। অজয়ই ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। তাতে কি হয়? এমন উৎসাহী পুলিশের লোক হয়তো কেউ আছে যে পুরোমাত্রায় নিঃসন্দেহ হতে পারছে না।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নিলে হয় লোকটাকে। না, এখুনি কোনো দরকার নেই। আগে হাটের এ রাস্তাটুকু পার হয়ে যাক্। এখানে অনেক ভিড়। অনেক পরিচিত লোক।

হাটের পথ ছেড়ে দিনেশ মাঠে নামল। এটাই তাদের গ্রামে ফিরে যাবার সোজা পথ, খুব জোরে পা চালিয়ে গেলে বড় জোর আধ ঘণ্টা।

তা ছাড়া মাঠটা মনে হল সবুজ মুক্তির মত। লোক-জনের ঠোকাঠুকি নেই, চোখ চাওয়া-চাওয়ি নেই। নেই বা চোখের কোণের কৌতূহলে চিহ্নিত করে রাখা। নিজেরা থেমে পড়ে অন্যকেও থামিয়ে দেওয়া। এখানে অনেক ফাঁকা। দরকার হলে ছুট দেওয়া যায় সহজে।

মাঠে নেমে ঘাড় ফেরাল দিনেশ। লোকটা আর পিছু নেয়নি। আমিনসুল্লার বেনেতি মশলার দোকানের সামনে এসেই থেমে পড়েছে।

না, পুলিশের লোক নয়। এ তারক সা।

খেজুরতলার বাজারে তারক সা'র মস্ত বড় কাপড়ের দোকান। দু'বছর আগে তার দোকান থেকে দিনেশ একটা মশারি কিনেছিল, আজও পর্যন্ত তার দাম দেওয়া হয়নি। দেব-দিচ্ছি, আজ-নয়-কাল অনেক টালবাহানা করেছে দিনেশ, তবু কথা রাখতে পারেনি। তলব-তাগাদায় কোনো ফল হয়নি দেখে আজকাল ওরা তার পিছু নেওয়া সুরু করেছে। এত দিন দোকানের ছোকরা দুটো পিছু নিত, আজ খোদ কর্তা উঠেছে ক্ষেপে।

মশারিটা না কিনে উপায় ছিল না। ছেলে মেয়ে অসীমা ও তার—সকলের প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া। তা ছাড়া মশার কামড়ে কারু পুরো রাত ঘুম নেই। দাম সে দেবে। তার ইচ্ছে আছে ষোল আনা। দাম যে পাবে তার চাওয়ার মধ্যে যে ন্যায় আছে এ সম্বন্ধে সে সন্দেহ করে না। কিন্তু কোত্থেকে সে দেয়!

নিজের গ্রামে এসে পড়েছে দিনেশ। খালের মুখেই কেশবের সঙ্গে দেখা।

'কি মশাই, কাগজের দামটা দেবেন না?'

দিনেশ মাথা নামাল। বললে, 'দেব।'

'দেবেন-দেবেন বলছেন তো আজ এক বছরেরও উপর, কথার তো কাণাকড়িরও দাম নেই। মাষ্টারি করেন তো ছেলেদের কি শিক্ষা দেন জিগগেস করি?'

খবরের কাগজের সামান্য একটা হকার। ইস্কুলের চৌকাঠও হয়তো কোনো দিন মাড়ায়নি। সে পর্যন্ত গলা উঁচিয়ে দুঃসাহসীর মত তাকে শাসন করে। মনে করে নর্দমার পোকা।

দু' মাসের খবরের কাগজের দাম বাকি। সাত টাকা কয়েক আনা। এক সঙ্গে যে ফেলে দিতে পারে এমন ক্ষমতা নেই দিনেশের। দু' আনা চার আনা করে নিতে কেশব রাজি নয়। সে কি ভিখিরি ?

তার মানে দিনেশ ভিখিরির চেয়েও অধম।

স্বভাব-চরিত্র জাত-জন্ম নিয়ে কেশব অনেক কুকথা বলতে থাকে পিছন থেকে। শুনলেও শোনেনি এমনি ভাব করতে হয় দিনেশের। ঘেয়ো কুকুরের মত লোকের স্পর্শ বাঁচিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে যায় দিনেশ। লেজ গুটিয়ে মাথা হেঁট করে।

এক বছর সে খবরের কাগজ পড়ে না। জানে না দেশ এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। জানে না কবে ঘুচবে তার এই দারিদ্র্য, এই লজ্জা আর ভয়। তার আর কোনো স্বপ্ন নেই, কোনো কৌতূহল নেই।

কত দূর এগিয়ে আসতেই নগেনবাবুর সঙ্গে দেখা। সাব-ডিভিশনের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, প্রায়ই গ্রামে আসেন স্কুল পরিদর্শন করতে। আশে-পাশে যেখানেই যখন আসেন দিনেশের সঙ্গে দেখা করে যান। অনেক দিনের জানা-শোনা।

আর, যখনই দেখা করেন, ঘ্যানর-ঘ্যানর ঘ্যানর-ঘ্যানর করেন অনেকগুলি। বলেন তাঁর দারিদ্র্য দুর্দশার কথা। সকলে কেমন খুঁটে খুঁটে ঠুকরে ঠুকরে ঘুস নিচ্ছে আর তিনি খুঁদকুঁড়োও নিচ্ছেন না, সেই সাধুতা বা অক্ষমতার বর্ণনা। প্রকাণ্ড পরিবার, সামলে উঠতে

পারছেন না এই সামান্য আয়ে। বড় ছেলেটাকে পড়াতে পারলেন না বেশি দূর, বেকার বসে আছে। মেয়ে দু'টো ধাড়ি হচ্ছে দিন দিন, পাত্র জুটছে না। নিজের আমাশা না অর্শ, চিকিৎসার পয়সা নেই।

এতো সব দুঃখের কথা ; মামুলি, এক-রঙা। এর মধ্যে তো অপমান নেই!

'ধার নেই আপনার? ছোট-ছোট ধার?' জিগগেস করে দিনেশ।

'না, ধার করি এমন সাধ্য কি। শোধ দেব কোত্থেকে?'

তা হলে তিনি তো পরম সুখী। যা তাঁর মাইনে তাই দিয়েই কষ্টেসৃষ্টে টায়েটোয়ে তাঁর সংসার চলে যায়। তার পরেও তাঁর অভাব থাকতে পারে কিন্তু লাঞ্ছনা তো নেই। এক ধার শোধ করতে গিয়ে তাঁকে তো আরেক ধার করতে হয় না। এক গর্ত বোজাতে গিয়ে খুঁড়তে হয় না তো আরেক গর্ত! তিনি তো পৃথিবীতে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন। লজ্জায় তাঁকে তো মাথা হেঁট করে চলতে হয় না। ভয় পেয়ে ইঁদুরের মত তো পালিয়ে যেতে হয় না ভিড় দেখে? তাঁর মনে বিফলকামের বেদনা থাকতে পারে কিন্তু অপরাধীর গ্লানি তো নেই। তিনি দরিদ্র হতে পারেন, কিন্তু তিনি তো অপরাধী নন। তাঁকে তো কাউকেও ভয় করবার নেই পৃথিবীতে। তিনি সহানুভূতি পাবেন, ঘেন্না মেশানো অনুকম্পা তো তাঁকে কুড়িয়ে নিতে হবে না।

নগেনবাবুর ঘ্যানর-ঘ্যানর আর ভালো লাগে না। তার সঙ্গে তাঁর মিল নেই। সে অপরাধী! সে ঘৃণ্য। সে ধিক্কৃত।

সাঁকো

বাড়ির কাছে এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল দিনেশ। বাড়ির মধ্যে আর ঢুকল না। পাশ কাটিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়ল।

বাড়ির দোরগোড়ায় মহাদেব বল্লভ ব'সে। বল্লভ-মশাই বাড়ি-ওয়ালার লোক। প্রকাণ্ড গোঁফ, প্রচণ্ড গলার আওয়াজ। সব চেয়ে প্রচণ্ড তার অভদ্রতা।

একবার দু'মাসের ভাড়া বাকি পড়েছিল এক সঙ্গে, যেবার অসীমার খুব বড় রকম অসুখ হয়। তারপর যত ভাড়া সে দিয়েছে পর-পর, সব গিয়েছে বকেয়ার উশুলে। কিছুতেই হালনাগায়েৎ হতে পাচ্ছে না। মাঝে এক মাসের জন্য দশ টাকার একটা টিউশনি পেয়েছিল, তা ফেলে দিয়েছে সে ঐ বাড়িভাড়ার অন্দরে। তবু এখনো আঠারো টাকা বাকি। চলতি ভাড়া দিয়ে দিনেশের আর সাধ্য নেই কিছু দিতে পারে বকেয়ার মধ্যে।

কিন্তু কিছু আদায় না করে বল্লভমশাই আজ আর কিছুতেই নড়বেন না।

অসীমা ছেলেকে দিয়ে বলিয়েছে, বাবু বাড়ি নেই, কতক্ষণে ফিরবে কেউ বলতে পারে না, তাই আরেক সময় যেন সে আসে।

বাবু ভিতরে থাকলেও নেই, বাইরে থাকলেও নেই, কিন্তু এক সময় না এক সময় হয় বেরুতে নয় ঢুকতে তাকে হবেই এই দরজা দিয়ে। তাই বল্লভমশাই দরজা ছাড়বেন না কিছুতেই। আজ তাকে ধরে ঠিক টেনে নিয়ে যাবেন কাচারিতে।

অসীমা রান্নাঘরে উনুনের কাছে বসে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে। ছেলেরাও যেন অস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারছে তাদের বাবা অপরাধী,

অপদার্থ! তাদের এই জন্ম ও জীবন সমস্তই একটা অগৌরবের কাহিনী।

কেটে পড়লেও বেশি দূর নিশ্চিন্ত হয়ে এগুতে পারল না দিনেশ। কত দূর যেতেই ষ্টার ফার্মেসির অখিলের সঙ্গে দেখা। সরে পড়তে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অখিল সরাসরি তার হাত চেপে ধরল।

ওষুধের বিলের পাওনাটা আজও সম্পূর্ণ শোধ করা হয়নি। তাই বলে রাস্তার মাঝে অমনি হাত চেপে ধরবে নাকি?

অথচ একটা যে সমর্থ প্রতিবাদ করে এমন ক্ষমতা দিনেশের নেই। বরং পীড়িতের মত অসহায় মুখ করে বললে, 'এ মাসের মাইনে পেলেই দিয়ে দেব টাকাটা।'

'অনেক মাইনেই তুমি পেয়েছ এ পর্যন্ত! আর ও কথায় ভুলছিনে।' অখিল হাতটা জোরে চেপে ধরে টানতে লাগল সামনের দিকে। যেন কোথায় তাকে নিয়ে যেতে চায়।

'জানো তো সামান্য মাইনে, তায় অসুখবিসুখ, সব দিক গুছিয়ে উঠতে পারিনে।'

'সামান্য মাইনে তো, ডাক্তারকে দিয়ে অসামান্য ওষুধ বাতলিয়েছিলে কোন সাহসে? তখন খেয়াল হয়নি সামান্য মাইনের থেকে অসামান্য অষুধের দাম দিতে পারবে না?'

'বলো, স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তোলা কি স্বামীর কর্তব্য নয়?' আততায়ীর সহানুভূতি উদ্রেক করবার জন্যে দিনেশ সজল কণ্ঠে বললে, 'তখন কি করে সে বাঁচবে, কি করে সে একটু আরাম পাবে, তারি সন্ধানে হন্যে হয়ে ফিরতে হয়। তখন ওষুধের দাম বেশি কি আমার ক্ষমতা কম এসব কথা কি মনে আসে?'

'সুবিধে আছে যে।' অখিল বিকট ভঙ্গিতে মুখ বেঁকাল: 'তক্ষুনি-তক্ষুনি যে নগদ দাম দিতে হল না। মাষ্টারমানুষ দেখে তখন যে আমি বিশ্বাস করেছিলাম মাসকাবারেই দামটা পেয়ে যাব। তখন কি জানি তুমি এতখানি জোচ্চোর?'

দিনেশ বুঝতে পেরেছে তাকে পাশেই আর কারু দোকানঘরে জোর করে টেনে নিয়ে যাবে। সেখানে দরজা বন্ধ করে অখিল ও তার বন্ধুরা তাকে মারবে, মেরে গায়ের ঝাল মেটাবে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে দিনেশ। তবু বাধা দিতে গিয়েও সে বাধা দিচ্ছে না। একেকবার ভাবছে, মন্দ কি, যদি মার খেয়েই এই ভার নেমে যায়, যাক্। মনের যন্ত্রণা থেকে দেহের যন্ত্রণা অনেক তুচ্ছ, অনেক সহনীয়। তবু, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কে যেন ভিতর থেকে বাধা দিচ্ছে, তার জোর নেই, বৈধতা নেই, তবু বাধা দিচ্ছে। বলছে, মার খেলেও ধার মুছে যাবে না। আবার এমনি আরেক দিন অখিল হাত চেপে ধরবে।

রাস্তা থেকে কারা-কারা এসে ছাড়িয়ে নিল দিনেশকে, প্রৌঢ় ব্যক্তিরা কেউ-কেউ অখিলকে মৃদু তিরস্কার করলে। কিন্তু নির্ভুল ভাব দেখালে, সমস্ত ন্যায় ও ধর্ম অখিলের দিকে।

তক্কে-তক্কে থেকে ফাঁকা দরজা পেয়ে দিনেশের বাড়ি ঢুকতে প্রায় আড়াইটে। স্নানাহারের কাছে দিনেশের চেয়ে আগে বল্লভমশাই পরাস্ত হয়েছেন। লাঠি ঠুকে তিনি শাসিয়ে গেছেন এবার যখন আসবেন চাল-চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে আসবেন, দেখা যাবে ধরতে পারেন কিনা বাছাধনকে। দূরের রাস্তা, আজ আর বেশিক্ষণ ধন্না দেবার তাঁর সময় নেই। পরের বার যেমনি কচু তেমনি তেঁতুল হয়ে আসবেন তিনি।

'এত দেরি হল ?' অসীমা এসে জিগগেস করলে।

'খেজুরতলা কি সামান্য পথ ? তারপর ও কি ছাড়ে !'

'কেন, ডেকেছিল কেন ?'

'তিন দিন পর ও ছাড়া পাবে, অর্ডার এসে গেছে নাকি। যাবে কলকাতা। তাই ভারি ফুর্তি দেখলাম।'

'জেলে থাকতেও তো ফুর্তি কম দেখি না।'

'সে তো আর আমাদের মত জেল নয়।' দিনেশ গা থেকে সার্টটা খুলে ফেলল। অনেক নিষ্ফল ক্লেশের দীর্ণরেখা দিয়ে পাঁজর গুলি আঁকা।

'খেজুরতলা থেকে কলকাতা কোন পথে যাবে ?'

'বললে যাবার পথে আমাদের এখানে থেকে যাবে এক দিন।'

'কি সর্ব্বনাশ !' অসীমা চমকে উঠল : 'তুমি রাজি হলে ?'

'কি করে না করি বল ? বন্ধু লোক, তা ছাড়া এত দিন পর ছাড়া পাচ্ছে। আমিই বরং ওকে আগ্রহ করে নেমন্তন্ন করলাম।'

অসীমা ঝলসে উঠল। এমন একজন গণ্যমান্য লোককে অভ্যর্থনা করে বাড়ি নিয়ে আসবার তোমার কী সঙ্গতি আছে ? কোথায় দেবে তাকে বসতে, কী বা জোটাবে তার আহার ? অতিথি এলে ভালো-মন্দ খেতে দিতে হয়, রান্নার বিশেষত্ব আনতে হয় একটু, তা সংগ্রহ করবার তোমার সামর্থ্য কোথায় ? ঘরে সমস্ত কিছু তোমার বাড়ন্ত, তা ছাড়া, বাজারে ধার মেলে না।

'ডাল-ভাত যাই রান্না করে দেবে তাই খাবে ও তৃপ্তি করে। তোমার রান্না সাধারণ হতে পারে, কিন্তু ও তো সাধারণ নয়। তা ছাড়া কত দিন মেয়েদের হাতের রান্না ও খায়নি, পায়নি লক্ষ্মীর হাতের সেবা।'

আহা, কী তোমার লক্ষ্মীর ছিরি! রোগে ভুগে-ভুগে শেওড়া গাছের পেত্নী হয়ে গিয়েছে। পরনে একটা আস্ত শাড়ি নেই, টেনে-বুনুতে কুলোয় না। অপরিচিত কাউকে দেখে যে ঘোমটা টানবে তার উদ্‌বৃত্তি নেই। ছেলেপিলেগুলোর নোংরা চেহারা, নোংরা ব্যবহার। সমস্ত ঘর-দোর একটা আস্ত আঁস্তাকুঁড়।

'এতে তোমার অস্বস্তি হচ্ছে কেন? যে লোক দেশের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে তার কাছে আমাদের কিসের ভয়, কিসের লজ্জা? তার চোখে আমরাও তো তার দেশ। আমাদের এই দুঃখ আর দুর্বলতা তার চোখে তার দেশেরই দুঃখ, দেশেরই দুর্বলতা।'

শুধু কি তাই?

তারপরে সকাল থেকে পাওনাদারের মিছিল বসবে না তোমার দোরগোড়ায়? বিছের কামড়ের মত সর্বাঙ্গে তোমাকে অপমানের দংশন করবে না? তখন কলঙ্কিত মুখ তুলে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাতে পারবে? তোমার অপরাধ আর অকীর্তি ঢাকবে কি করে? এমনিতেও যদি সহনীয় হত, বন্ধুর সান্নিধ্যে তা আর সহ্য করতে পারবে না। আত্মদাহ নির্বাণ খুঁজবে তখন আত্মহত্যায়। না, দরকার নেই, বন্ধুকে গিয়ে বলো, বাড়িতে ঘোরতর অসুখ হয়েছে, অভ্যর্থনা সম্ভব হবে না। আমাদের পাপ আর গ্লানি, দুঃখ আর অপমান আমাদের মধ্যেই থাক, আত্মীয়-বন্ধু কাউকে তার মধ্যে উঁকি মারতে দিতে পারব না। মুখে কালি মেখে তুমি মাথা হেঁট করে বসে থাকবে আর পাশে বসে তোমার বন্ধু সকরুণ স্তব্ধতায় তোমাকে সহানুভূতি করবেন বা শেষ পর্যন্ত অর্থসাহায্য করতে চাইবেন, সে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। ব্যঞ্জনের সঙ্গে চোখের জলের নুণ মেশান এ

সইবে না আমার। অপমানিতের মত এক কোণ থেকে আরেক কোণে গিয়ে লুকোব, চোখ তুলে তাকাতে পারব না মুখের দিকে, এই অপমান থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

এবার সত্যিই ভয় পেল দিনেশ। নিজের লজ্জা স্ত্রীর লজ্জা শিশুদের লজ্জা পরের চোখ দিয়ে দেখতে হবে এ-জ্বালা সত্যিই অসহ্য। এমন ভাবে দেখেনি সে তার দৈনন্দিন জীবনের চেহারা। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। নিমন্ত্রণ করে এসে এখন আর বন্ধুকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

তারপর অজয় যখন এল এ বাড়িতে, মনে হল নতুন একটি দিন যেন পৃষ্ঠা বদলে দেখা দিয়েছে, আশ্চর্য্য দীপ্তির অক্ষরে। কোথাও দৈন্য নেই, দুঃখ নেই, অসম্মান নেই। সমস্ত পাপের চেয়ে বড় যে পাপ সে ভয় নেই। আমি অক্ষম আমি পরাজিত এ বেদনার কালিমা মুছে গেছে। ঝকমক করে জ্বলছে এখন সাহসের তলোয়ার। জীবনের ছেঁড়া তারে সে হঠাৎ বিদ্রোহের সুর বেঁধে দিয়েছে। শুনিয়েছে দেশের ডাক। নবজীবনের মন্ত্র।

রান্নাঘরে ছিন্ন আঁচলে মুখ ঢেকে অসীমা কাজ করছে আর শুনছে। তার বন্দী প্রাণ-পক্ষ স্পন্দিত হচ্ছে থেকে থেকে।

কিন্তু কে জানে এ মোহ কতক্ষণ!

'বাবুমশাই, আছেন না কি বাড়িতে?' নির্ঘাৎ মহাদেব বল্লভের গলা। 'আজ একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে এসেছি। আজ আর সহজে পথ ছেড়ে দিচ্ছি না।' লাঠি ঠুকতে লাগল মহাদেব। তার পিছনে পাইক পেয়াদা।

আওয়াজ শুনে এতটুকু হয়ে গেল দিনেশ। কি করবে কোথায়

লুকোবে ভেবে পেল না। ভেবেছিল, কেন ভেবেছিল কে জানে, অন্তত আজকের দিনটি সে রেহাই পাবে তার বরাদ্দ লাঞ্ছনা থেকে। ভগবান আজ আর তাকে তার বন্ধুর সামনে নাকাল করবেন না।

বাড়ির সামনে খোলা জমিটুকুর উপর একটা চেয়ারে বসে অজয় বই পড়ছিল, জিগগেস করলে, কী ব্যাপার!

ব্যাপার ঘোরালো। শালা মাষ্টার বাড়ির ভাড়া দিচ্ছে না। তাগাদা দিতে দিতে পায়ের হাড় খসে পড়ছে পচে পচে, তবু গায়ের চামড়া ফুঁড়ে ভদ্রতা গজাচ্ছে না মাষ্টারের। কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘরের ভিতরে থাকলে বাইরে আসে না, বাইরে থাকলে ভিতরে ঢোকে না। রাস্তায় দেখা হলে দৌড় মারে। কিন্তু আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। যখনই হোক, যতক্ষণ পরেই হোক, মাষ্টারকে আজ জমিদারের কাচারি-বাড়ি ধরে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, মধ্যম হিস্যার জমিদার-বাবুই বাড়িওয়ালা।

'দিনেশ!' সবল কণ্ঠে ডাকতে লাগল অজয়।

'যতই ডাকুন, আমার গলার আওয়াজ পেয়েছে যখন, তখন ও কিছুতেই আসবে না।' মহাদেব গম্ভীর মুখে বললে, 'ও এখন ইঁদুরের গর্ত খুঁজছে। দেখুন গিয়ে লুকিয়েছে হয়ত তক্তপোষের তলায়।'

অজয় আবার তীব্র স্বরে ডাকতে লাগল।

স্ত্রীর দিকে করুণ চোখে তাকাল একবার দিনেশ। না, বাইরে না গিয়ে আর উপায় নেই।

'তুমি বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে আছ কেন? শুনছনা এই ভদ্রলোক তোমাকে ডাকাডাকি করছেন?' অজয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'তুমি বোসো এই চেয়ারটায়। হ্যাঁ, আমি বলছি, বোসো।

আমি সব শুনেছি ওঁর কাছ থেকে। তাতে তোমার অমন মুখ ম্লান করে থাকবার কথা নয়। কোনোই তুমি অপরাধ করনি যে ভয়ে-ভয়ে পালিয়ে বেড়াবে। বোসো বলছি চেয়ারটায়!'

দিনেশ বসল।

'মুখোমুখি তাকাও এখন একবার ঐ বল্লভমশাইর দিকে। তাকিয়ে স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে বল, টাকা আমি দেব না।'

'দেব না?' দিনেশ নিজেই চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, দেবে না। মানে, এখন, যতক্ষণ না পার, যতদিন না দিন ফেরে, ততক্ষণ, ততদিন তুমি দেবে না। যেই মূহূর্তে স্বচ্ছলতা আসবে সেই মূহূর্তে দিয়ে দেবে। এর মধ্যে কোনো পাপ নেই, কোনো লজ্জা, কোনো ভীরুতার লেশমাত্র নেই। ওদের বেশি ছিল ওরা দিয়েছে, তোমার অল্পতমও নেই, তুমি দিতে পাচ্ছ না। এর মধ্যে এতটুকু অন্যায় নেই। যখন আবার ওদের থাকবে না আমাদের থাকবে তখন আবার ওদেরকে আমরা শোধ দেব। হব সমান সমান। যা সত্য তা কখনো ধর্মের আইনে তামাদি হয়ে যায় না। লেন-দেন হিসাব-নিকাশ সব এক দিন বুঝসমুঝ হয়ে যাবে।'

আশ্চর্য্য, অজয় যা বললে তাই দিনেশ পুনরুক্তি করলে। মহাদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে, স্পষ্ট দৃঢ়-কণ্ঠে। প্রত্যেকটি কথা বুকের মধ্যে অনুভব করে করে। বলতে-বলতে গায়ে তার জোর এল, ভঙ্গিতে এল কাঠিন্য। সে যে অপরাধী নয় চোখে এল সেই অনুভূতির দীপ্তি।

যেন একটা অনড় কুয়াশা উড়ে গেল এক মুহূর্তে। নতুন বাতাসে প্রত্যেকটি নিশ্বাস তার পবিত্র মনে হতে লাগল, রক্তে এল সাহসের তীক্ষ্ণতা। সবাইর সামনে দাঁড়াতে পারে সে মুখোমুখি।

এল খেজুরতলায় তারক সা।

'বাবু আছেন?'

'এই যে আপনার সামনে জলজ্যান্ত বসে আছি দেখতে পাচ্ছেন না?' স্পষ্ট নির্ভীক কণ্ঠে বললে দিনেশ। 'কেন মিছিমিছি ঘোরাঘুরি করছেন? আমার হাতে এখন টাকা-পয়সা নেই, আমি এখন দিতে পারব না। কখন পারি তারো ঠিক নেই। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যখুনি সক্ষম হব যেচে গিয়ে আপনার টাকা দিয়ে আসব। আর যদি কোনো দিন নাই পারি, জানবেন, আপনারই দিন শুধু ফিরেছে, আমরা তেমনি সেই লোকসানের ঘরেই পড়ে আছি। কিন্তু যেদিন লাভের কোঠায় উঠে আসব সেদিন আমার-আপনার সকলের লাভ।'

সত্যি, খোলস বদলে নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে দিনেশ। অনেক ঘোরাঘুরির পর পেয়েছে ঠিক জায়গা, ঠিক ভঙ্গি। সে অপরাধী নয় পেয়েছে এই আশ্চর্য্য সংজ্ঞা। জীবনে কেউ অপরাধী নয়।

'আমি আদালত করব।' বললে তারক সা। মনে হল সে-ই এবার ভয় পেয়েছে।

'করো, আদালত লম্বা কিস্তির হুকুম দেবে।' বললে অজয়। 'আর সে-কিস্তি খেলাপ করার অধিকার আছে দেনদারের।'

দিনেশ শব্দ করে হেসে উঠল।

অনেক বৎসর পর এই তার প্রথম উচ্চ হাসি। আমার অক্ষমতা আমার অপমান নয়। আমার বিফলতা নয় আমার অপরাধ। দিনেশ আবার হেসে উঠল। অক্ষমতা আর বিফলতা সত্ত্বেও আমার অধিকার আছে বাঁচবার। অধিকার আছে সেই অক্ষমতা ও সেই

বিফলতা দূর করে দেবার। লোকসান থেকে লাভের ঘরে চলে আসবার।

ডাকে এবার অখিল সমাদ্দারকে। দেখি তার হাতের কবজিতে কত জোর।

অখিল এল না।

তারপর বাকি আছে কেশব। ডাক তাকে। দু' আনা চার আনা করে নিতে তার এমন কি অসুবিধে? আমার ইচ্ছে আমি দু' পয়সা চার পয়সা করে দেব। আমার সুবিধে মত।

এল কেশব। একখানা কাগজ দিয়ে গেল দিনেশের হাতে। বলে গেল, 'যখন যেমন সুবিধে তেমনি দেবেন।'

আজ অনেক দিন পর শান্ত, নিশ্চিন্ত সাহসে বাইরে বেড়াতে বেরুল দিনেশ। সে খুঁজে পেয়েছে দাঁড়াবার ঠিক জায়গা, দেখবার ঠিক ভঙ্গি। সে অপরাধী নয়, সে কাপুরুষ নয়। সে অভিযাত্রিক। নিজের মাঝে বহন করে বেড়াচ্ছে সে নবীন দিনের সম্ভাবনা।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে শুনতে পেল কার চাপা কান্নার শব্দ।

পা টিপে টিপে এগুলো সে দরজার দিকে।

দেখল, অজয়ের কোলের মধ্যে মুখ রেখে অসীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

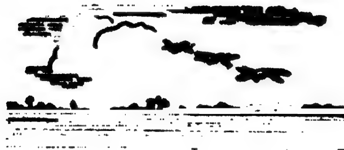
তার পরে ঠিক সময়ে ঘরে বাতি জ্বলল, উনুন ধরানো হল, রান্না করতে গেল অসীমা। অতিথির জন্যে আরেক কিস্তি রাঁধলে নতুন করে। এই রাতটা থেকেই ভোর বেলা অজয় রওনা হয়ে যাবে। বাইরের ঘরে তার বিছানা করে দিয়ে এল অসীমা। তার পর তার নিজের ঘরে সে শুতে এল, দিনেশের পাশটিতে।

কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। সেই নোংরা কাঁথা-তোষক, নোংরা মশারি, সেই উত্তপ্ত অনিদ্রা। সেই প্রতিশ্রুতিহীন কালো রাত্রি।

চোখ বুজে শুয়ে আছে অসীমা। বোঝা যাচ্ছে ঘুমুতে পারছে না। চোখের চার পাশে লেগে আছে এখনো বা জলের মালিন্য।

'আমার দিকে তাকাও। চোখ মেল।' শান্ত কণ্ঠে বললে দিনেশ। একবার চোখ মেলেই আচ্ছন্নের মত আবার অসীমা চোখ বুজল।

'না, চোখের দিকে তাকাও স্পষ্ট করে। তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো লজ্জা নেই। তুমি অপরাধী নও।' অসীমার উন্মীলিত চোখের উপর দিনেশের দৃষ্টির স্নিগ্ধতা চুম্বনের মত নেমে এল। 'যদি তুমি বুঝে থাক তোমার সন্তান, তোমার ঘর-সংসার, সমস্ত কিছুর চেয়ে তোমার দেশ বড়, তোমার দেশের জন্যে সব কিছু তুমি ছেড়ে চলে যেতে পার মুহূর্তে, তা হলে তুমি কোনোই অপরাধ করনি।'



লালমালা

'মাগো, দেয়ার কি ডাক!'

লালমালা দু হাত দিয়ে কান ঢাকল। কোলের মেয়েটাকে টেনে নিল বুকের মধ্যে। ডাকল, 'আম্মাজান।'

'দেও নেমেছে। দেও নেমেছে।' বুড়ি শাশুড়ি চেঁচিয়ে উঠল হুতোশ-লাগার মত : 'শামসু ফিরবে কখন?'

কোন সকালে দুটি পানি-পান্তা খেয়ে শামসের মানখালির হাটে গেছে। হাটে গেছে পান বেচতে। হাটে তার বাসিন্দে দোকান নেই। সে খোলা পান ফিরি করে বাড়ি-বাড়ি।

হাটের পানমহল ইজারা নিয়েছে প্রসন্ন বারুই। প্রসন্নর বরজে শামসের কাজ করে। জোগান দেয়। পান ভাঙে। মজুরির কোলে পান পায়। সে পান বিক্রি করে ডালায় করে।

বড় নামা অবস্থা। ভিটেটুকুর বাইরে এক কড়াও জমি নেই। নাড়ার ঘর। হোগলা পাতার বেড়া। বাড়ির সামনে চটানে পতিত জমিটুকুতে শুধু কটা শশা কুমড়োর ক্ষেত।

কিন্তু বউ পেয়েছে খুবসুরৎ। যেমন গঠন-গাঠন তেমনি মুখের ছাঁদ। এক বোঝা চুল পিঠভরা। কাঁকালটি চিকন। লাটার মত চোখ। গায়ের রংটি পাকা শশার মত। এত রূপ, যেন হাঁটতে

চলতে ওর কত কষ্ট। ও যেন একটি হলদে পাখির ছা।

চর অঞ্চলের গ্রাম। চারদিকে নদী। নদী বোলোনা, বলো সমুদ্দুর। ডাঙ্গা কতটুকু? কেবল ডহর। বাও-বাতাসের দেশ।

সকাল থেকেই টিপ টিপ করে বর্ষা হচ্ছে। ডিঙি নিয়ে ভেসে পড়েছে শামসের। ফিরবে বিকেলে। হাট উঠে গেলে। যদি ভালো বেচাকেনা হয়, হাটের থেকে লালমালার জন্যে কিনে আনবে ঝিকমিকে রেশমী চুড়ি।

দুপুরটাও গেল অমনি একঘেয়ে খ্যানখ্যানানিতে। বিকেলের দিকে দেখা গেল যেন রোদের কটা উঁকিঝুঁকি। খুশি হয়ে লালমালা বেরিয়ে এল বাইরে। সামনের ধানী জমির থেকে শামুক কুড়িয়ে আনবে। হাঁসের বাচ্চার জন্যে। আজ মাছ না জোটে, পোষা পাখির ডিম রেঁধে দেবে পুরুষকে। বাজার সওদায় দরকার নেই, ঘরের মানুষ ঘরে আসুক।

জল-পিঁপি ডাকছে বুঝি একটা। ও বুঝি ডাক-পাখির ডাক। কিন্তু ও কী পূব দিকে?

পূব দিকে পায়লা নদী। কী যেন কালো মতন একটা থাম জমিন থেকে উঠে গেছে আসমানের দিকে। দেখতে ভয় করে।

'কী ওটা আম্মাজান?'

মুখ গম্ভীর করে শাশুড়ি বলে, 'জলস্তম্ভ।'

চাষাদের জো-র সময় এখন, রাতে খুব বর্ষণ হবে আর-কি। দাঁত ছিরকুটে তুফান না ছুটলেই রক্ষে। শামসু ফিরে আসুক ভালয়-ভালয়।

কালি হয়ে এল চারিদিক। পাখিরা উড়ে চলল পশ্চিমে।

দেও নেমেছে। দেও ভূত। শিঙা বেজেছে। কেয়ামতের দিন এসেছে ঘনিয়ে।

'মাগো, দেয়ার কি ডাক!' লালমালা ডুকরে কেঁদে ওঠে: 'কখন ফিরবে হাটের ঠেঙে।'

কখন ফিরবে! দেও-ভূতের রাত, কে কার খবর রাখে! কে কাকে পুছ করে। কে কাকে বুঝ-প্রবোধ দেয়।

লালমালার বুকের মধ্যে ঝড়। বুড়ি শাশুড়ির হাত পা কাঁপছে থর থর করে।

আওয়াজটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। লালমালা রেড়ির তেলের বাতি জ্বালাল। একটা মাটির হাঁড়িতে তুষ ঢেলে কয়েক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে রাখল। আগুনের তাওয়ার কাছে বসল শাশুড়িকে নিয়ে। বললে, 'আল্লারসুলের নাম নেন। যেন ফিরে আসেন শুভেলাভে।'

পীরের দরগায় কত চেরাগ-বাতি জ্বালল তারা মনে-মনে। খোয়াজ-খিজিরকে কত লোভ দেখাল। একমাত্র রোজগারী লোক, শামসের যেন বেঁচে থাকে।

বৃষ্টিতে জোর নেই। না, বৃষ্টি আসুক আকাশ ভেঙে। বৃষ্টি এলে যদি বাতাসটা কম পড়ে। নদী একটু ঠাণ্ডা হয়।

শব্দটা এবার এসে পড়েছে গাঁয়ের কিনারায়। এ-বাড়ি ও-বাড়ি আজানের ধ্বনি উঠছে। বিদ্যুতের চাবুক হাতে নিয়ে এসে পড়েছে মহাপ্রলয়। জলের গর্জন তার শিঙার আওয়াজ।

কারা যেন চারদিক থেকে একসঙ্গে হাত লাগিয়ে তাদের বসত ঘর ধরে ঝাঁকি দিল। কোথায় গেল চাল আর ছাপ্পর, কোথায় বা

খাম-খুঁটি। বেড়া আর মাচ'ন। চারদিক ফর্দা-ফর্সা হয়ে গেছে। মাচান চাপা পড়েছে আম্মাজান। শোনা যাচ্ছে তার কষ্টের গোঙানি। কিংবা না, ও হাওয়ার শনশন।

কে কাকে খবর করে। লালমালা একবার ডেকে উঠল: 'আম্মাজান।' বাইরে থেকে দমকা হাওয়া উত্তর দিল: 'ইয়ানফসী, সারো, সারো, আপন সারো, আপন সামলাও।' ঘরেব পিঁড়ার মধ্যে গর্ত করে ছাগলের যে খোপ ছিল তারি মধ্যে লালমালা ঢুকল তার মেয়ে নিয়ে। একটা শেয়াল এসেছিল খ্যাঁক করে, অমনি ছুটে পালাল। লালমালার ভয়ে নয়, জলের ভয়ে।

জল ছুটছে। বাঁধ-ভেড়ি ভেঙে, ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। জেলভাঙা কয়েদীর মত।

কোথায় দাঁড়াবার জায়গা? মেয়ে বুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল লালমালা। 'আপন সারো, নিজেকে সামলাও।' মিথ্যে কথা। এই জ্বলন্ত জলের মধ্যেই দেখা হয়ে যাবে শামসেরের সঙ্গে। মেয়ে নিয়ে লালমালা জলে ভাসল।

গ্রামের উড়কুড় উঠে গেল এক রাত্রে। বাঁশ ঝাড়ে বাঁশ নেই, সুপুরি বনে একটি গাছ নেইও আর সিধে হয়ে। আম-কাঁঠাল-নারকেল সব লোপাট হয়ে গেছে। পাখি ভাসছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। ভাসছে গরু-মোষ, শেয়াল-কুকুর, মানুষের গা ঘেঁসে। ভাসছে দোরা-বোরা কেউটে-কালনাগ। সব বেহুঁস, নির্জীব, কে কাকে হিংসে করবে! উলটে পড়ে রয়েছে নৌকো। বেড়া আর ছাউনি উড়ে-উড়ে এসে একটার পর একটা জড় হয়ে মস্ত পাহাড় হয়ে উঠেছে।

শামসেরকে পাওয়া গেল তিতকাটার খালের মুখে। আর লালমালাকে নায়েব বাড়ির কাঠের পাটাতনের উপর। বুকের মেয়ে কখন ছিটকে গিয়েছে বুকের থেকে।

শামসের মরে গেছে গাছ পড়ে। কিন্তু লালমালা মরেনি। ভোররাতের দিকে বাতাস নরম পড়ল, জল নেমে গেল, বৃষ্টির ছিটেফোঁটাও রইলনা। আকাশ ঘসামাজা হয়ে ফুটে উঠল পুব দিকের তারা কটা। সব চেয়ে যেটা জ্বলজ্বলে, নায়েব সাহেবের মনে হল সেইটেই লালমালা।

লালমালার একবারটি হয়তো ইচ্ছে হয়েছিল শামসেরকে একটু দেখে, প্রাণের পুতুলি মেয়েটাকে একটু খোঁজ করে, মাচানটা তুলে ধরে দেখে নেয় নিজের চোখে, বেঁচে আছে কিনা আম্মাজান। কিন্তু না, মাওলা বক্‌সর ভীষণ আপত্তি। এমন পটের বিবিকে পর্দার বাইরে পাঠাতে সে রাজি নয়। আর যা গেছে মরে-হেজে তার জন্যে মায়ামোহ করে লাভ নেই।

শিউরে উঠল লালমালা। কাল তার পিঠের উপর দিয়ে কেউটে চলে গিয়েছিল একটা। তখনো সে শিউরে উঠেছিল। কিন্তু এ শিউরোনোর অন্য রকম সোয়াদ।

নায়েব সাহেবের আরো দুজন জননা আছে, বয়েস হয়েছে কিছু, পাকধরা দাড়িতে মেহেদি পাতার রং লাগানো। তা হোক, কিন্তু খুব বড় অবস্থা। খাসে আর প্রজার মুখে জমি আছে বিস্তর। আউষ-পউষ দুরকম ফসল হয়। মোষের হাল আছে। হালিয়া চাকর আছে। সরকারী মুহুরি আছে মোতায়েন।

আসলে তশিলদার, দেশ-দেশী লোক সম্মান করে বলে, নায়েব

সাহেব। তার মানের জন্যেই তো প্রত্যেক দাখিলায় তার নজর বাঁধা।

এ হেন নায়েব সাহেব লালমালাকে নিকে করতে চায়। ইদ্দতের তিন মাস দশ দিনও সবুর করতে চায় না। লালমালার বুকের মধ্যিখানটা কচি কলাপাতার মত কাঁপতে লাগল।

সাত কানি ভুঁইর মাথায় নবু মুন্‌সির বাড়ি। নবু মুনসির চোখ পড়েছে ওদিকে। আ'সা-যাওয়া করছে এ পাড়ায়। কোথায় কে চাচা দাঁড় করিয়েছে লালমালার, তার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা নিয়ে কওয়াকওয়ি করছে।

দেরি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মাওলা বক্‌স রাষ্ট্র করে দিল, শামসের এই বন্যায় মরেনি, মরেছে তার সাড়ে তিন-মাস আগে, ওলাউঠোয়।

তাই না গো লাল বিবি ?

লালবিবি মাথা হেঁট করে বলে হ্যাঁ, তাই। এই বর্ষায় নয়, গেল বছর শীতকালে।

মরা-জ্যাঁন্তা লেখে যে চৌকিদার, তার সঙ্গে মাওলা বক্‌স ঘর করলে। রেজেষ্টারিতে মৃত্যুব তারিখ লেখালে ছয়ুই পৌষ, কারণ লেখালে কলেরা। স্যানিটারি ইন্‌স্পেকটর তদন্তে এসে তাই জেনে গেল সাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে।

ইদ্দতে আটকালো না আর। কলমা পড়া হয়ে গেল।

লালমালার সন্তোষ তখন দেখে কে! রঙচঙে শাড়ি পায়নি শুধু। পেয়েছে সায়া-আঙিয়া, সায়বানী সহরের মেয়েদের মত।

চাঁদির গয়না পেয়েছে। পেয়েছে চটি জুতো। মেহেদি পাতায় হাতের পাতা রং করে। চোখে সুর্মা দেয়।

সব সময়েই অসুখ করেছে বলে ঢং করে বসে থাকে। তৃণ কাজটিও করেনা। জল আনেনা। ধান ভানেনা। জাব দেয়না। সেজেগুজে জাফরানি টিপ পরে বসে থাকে।

কাজকর্ম করেনা, কিন্তু কত্তাত্তি সব তার হাতে। চাবি-ছোড়ানি আগে মেজ বিবির হাতে ছিল। এখন তা ছাড়িয়ে এনে ছোট বিবির হাতে দিয়েছে। লালমালাই এখন বাকস-প্যাঁটরা নাড়ে-চাড়ে, খরচ-খরচা এখন তার নিজের হেপাজতে। মোটা করে আঁচলে তার চাবি বাঁধা। দাঁতওলা চাবি না ফুটোমুখো চাবি সব এখন তার মুখস্ত।

মেজ বিবি গোসা করেছে। মাওলা বক্সর সেও নিকাই বউ, এতদিন তারই দবদবা ছিল। চাবির গোছা ছিল তারই ঘুনসিতে। কিন্তু কোত্থেকে বানের জলে ভেসে-আসা কচুরিপানা এসে ঢুকল তাদের ধানক্ষেতে।

হোক কচুরিপানা, কিন্তু কেমন বেগুনি ফুল ফুটেছে। বিদেশী-বিদেশী দেখতে। আলগোছে বসে-বসে তাই দেখে নায়েবসাহেব।

খোসগল্প করে। বলে, মড়কখোলার মাঠে ছাগল খুঁজতে এসেছিলে সেদিন সন্ধেবেলা, মনে আছে?

কই না তো?

আমি যাচ্ছিলাম সামনা দিয়ে, খাজনার তাগাদায়। হাত ধরে ডাকলাম তোমাকে।

ওমা, সে কি কথা! আমি কী করলাম?

তুমি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলে মুখের দিকে। আমি বললাম, কী আছ অমন নাচার নালায়েকের ঘরে। আমার হাবেলিতে চল। পাটরাণীর মত থাকবে। চাবি-ছোড়ানি থাকবে তোমার জিম্মায়। চিনতে পারছ তো আমাকে?

সত্যি? তারপর? লালমালার যেন কিছুই মনে পড়ছে না।

আমাকে কাছে এগুতে দেখে তুমি চেঁচিয়ে উঠলে জোর গলায়। তারো চেয়ে জোর গলায় গালাগালি দিতে লাগলে। পথের লোককে ডাকতে লাগলে বাপ ভাই বলে। সে এক খাণ্ডার মূর্তি। আমি পালিয়ে যাবার রাস্তা পাইনা।

ওমা, তাই নাকি? লালমালা মিঠিমিঠি হাসে মুখ টিপে-টিপে।

নায়েবসাহেব আর আলগোছ থাকেনা। বলে, তখন অমন মারমুখী ছিলে কেন?

বা, তখন মন যে বান্ধা ছিল এক জায়গায়।

দুর-সুবাদের চাচা, তারই বাড়িতে নাইয়র এসেছে লালমালা। চাচার নাম-নিশানা ছিলনা, লালমালাই তার হাল ফিরিয়ে দিয়েছে। নায়েবসাহেবের বাড়ি থেকে ধান এনেছে, এনেছে সুপুরি নারকেল। কিন্তু চাচার এখন নগদ টাকার খাঁকতি।

পাশ-গাঁর মফিজ পালোয়ানকে ধরে এনেছে। বসিয়েছে উঠানে মোড়ার উপর। মফিজ তেজারতি করে, খতের পিঠে উশুল দিয়ে-দিয়ে কর্জের মেয়াদ বাড়ায়, সঙ্গে-সঙ্গে সুদ বাড়ায়। বাড়িতে

দালান আছে, ঘাট আছে, মজিদ আছে। মানে-ধনে সে মাওলা বক্‌সের চেয়ে অনেক তেজী। শত হলেও মাওলা বকসের লোহার সিন্দুক নেই। লালমালার হাতের মুঠোয় মফিজ তার লোহার সিন্ধুকের চাবি ছেড়ে দেবে।

আরো অনেক প্রলোভনের কথা। চাচা বলে, লালমালা রাজি হয় তো বিয়ে-ভাঙার মোকদ্দমা করে। মাওলা বক্‌স জায়-জিনিস দেয়নি, কাপড়-জামা দেয়নি, খোঁজখবর নেয়নি একদিনও, মারপিট করে জখম করেছে। দাগ কোথায়? বসন্তের দাগের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে সেই দাগ। আমার আবার বসন্ত হল কবে? তুই জানিস না, হয়েছিল একবার ছেলেবেলায়।

কু-সলা দিওনা চাচা, বেধর্মীর মত কথা কইও না। লালমালা রোখালো গলায় বললে।

আহা, ওটার জন্যে মায়া কিসের? ও তো বুড়ো মোষ, দাম নেই। এত দিন যে নিকে হয়েচে লালমালার, পেটে একটাও সন্তান এসেছে?

না আসুক। কিন্তু মন এখন বান্ধা হয়ে আছে যে।

খুন হল মাওলা বক্‌স। কোন প্রজার তৈরি ভাতে ছাই দিয়েছে। উঠোন চষে দিয়ে গেছে কার। বাড়ি-ঘর কার চৌপট করে দিয়েছে। ধানী জমি নিধানী করে দিয়েছে। আগুন দিয়েছে খড়ের কুঁড়েয়। আবদ্ধীয় সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছে হালের গরু।

খুন হয়েছে হাটে-ঘাটে নয়। পথ চলতে নয়। খুন হয়েছে ঘরের মধ্যে। বিছানায়। মাঝরাতে। লালমালাকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়েছে যখন নায়েবসাহেব।

জানলা খোলা ছিল এক পাশে। জানলা দিয়ে ল্যাজা ছুঁড়ে

মারেনি। পাছে বেভাগ হয়ে বেঁধে গিয়ে লালমালার শরীরে। কোনটা কার হাত পা অন্ধকারে ঠাহর করা যায়না দূর থেকে।

তাই খুনে সিঁধ কেটে ঢুকেছিল ঘরের মধ্যে। কাছে থেকে দুই দেহ ঠাহর করেছে ঠিক বরে। তারপর কাছে থেকেই কোপ বসিয়েছে। ছুরি-ছোরা নয়, গাছ-কাটা হাত-দা দিয়ে। মাওলা বক্স বাধা দিতে চেয়েছিল, কোপ তাই শুধু ঘাড়ে গলায় না পড়ে হাতে-মুখেও পড়ল গোটাকতক।

লালমালার একটি আঁচড়ও লাগল না। ঘরের একটি জিনিসও খোয়া গেল না। এখানে-ওখানে হাতের রক্ত মুছতে মুছতে ডাকাত চলে গেল দরজা খুলে।

শুধু চীৎকার। ডাক-সোর। উথল-পাথল।

বাতি জ্বাল। লোক ডাক। পিছু নে।

পয়লা বিবি ও দোসরা বিবি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করল, কিন্তু লালমালার মুখে টুঁ শব্দ নেই। সে দেখছে একটা রক্তের ঝড়। রক্তের বন্যা। রক্তের আগুন।

ঘরে ঢুকে কে খুন করে গেল? নিশ্চয়ই লালমালার মানুষ। সে আবার কে? লালমালার মানুষ তো লালমালাকে নিয়ে যায় না কেন সঙ্গে করে? ইদ্দত কাবার করে পরে নিকে করবে? কে? মফিজ পালোয়ান? মিথ্যে কথা। মফিজ পালোয়ান খুন-হওয়া লোকের জননাকে নিকে করে না। তার মান-সম্মান আছে।

অনেক গাছগাছড়া ঘর-বাড়ি পড়ে গিয়েছে, গাছ চাপা বাড়ি চাপা পড়ে মরেছে অনেক লোক। লালমালা দেখেছিল একটা হিংসুটে আকাশ। জলে ভেসে গিয়েছিল অনেক গরু-মোষ, ছেলে-বুড়ো, জল

মরে যাবার পর পড়ে থেকে পচে মরেছে। লালমালা দেখেছিল একটা আগুনমুখো নদী। কিন্তু মানুষের রক্ত যে এদের চেয়েও ভয়ংকর।

না, গায়ে তার লাগেনি ছিটেফোঁটাও। হাতে তার ও কিসের দাগ, হাতের তালুতে? রক্ত নয়, মেন্দি পাতার রং। ঠোঁটে? আলতার ছোপ। গায়ে? ও যৌবনের লালিমা। নাম তার লালমালা।

এবার নিকে করল সাদতালিকে। সাধারণ গৃহস্থ প্রজা। চাষ-বাস নিয়ে খেয়ে-পরে আছে একরকম।

এই ভাল। কানি সাতেক জমি আছে খাসে। নিজের হাল-বলদ আছে। গাই-গরু আছে। বয়স-স্বাস্থ্য আছে। সর্দারী লাঠি আছে হাতের মুঠোয়।

এই ভাল। ঘরে আর জননা নেই। আগের পক্ষের কাচ্চা-বাচ্চা আছে কতগুলো, কিন্তু সতীন যে নেই এই লালমালার শান্তি। ঘরসংসার করতেও সে, আমোদ-আহ্লাদ করতেও সে।

ঘরের মানুষ সেজেগুজে শুধু মনের মানুষ হয়ে বসে থাকবার কোনো মানে হয় না। ছবির বিবি হয়ে। এই ভালো। হেঁটে-চলে উঠে-বসে এই সংসারী করা। নদীর থেকে জল আনা, জঙ্গল থেকে কাঠ আনা। পিঁড়িতে আছড়ে আছড়ে সেদ্ধকরা কাপড় কাচা। কাঁচা ধোঁয়ায় ভাত রাঁধা। না খাটলে পিটলে শরীরের গড়ন-পিটন ঠিক থাকবে কি করে?

নায়েব সাহেবের বাড়িতে সে ফরসি টানত। এখন সে হুঁকো খায়। বিয়ের বাজারে ক্রমেই সে পড়ে যাচ্ছে। এ-সংসারে আর চাবি-ছোড়ানি নেই। বাঁশের ফুটোতেই তামাক-বিড়ি, বাঁশের ফুটোতেই

টাকা-পয়সা। নিপিত্তে হয়ে আছে, কিন্তু খোদাতালা করুন, নিফলা হয়ে যেন না থাকে। জমির জোরের মতই থাকে যেন শরীরের জোর।

কাজকাম সেরে রাতে যখন শোয় এসে লালমালা, কোথায় যেন একটা বাঁশি বাজে। শূন্যে না বুকের মধ্যে বুঝতে পারে না।

লালমালা ভাবে, সেদিন যে ঝড় উঠেছিল, বান ছুটেছিল, তার মাঝেও কি বাঁশির এমনি শব্দ ছিল না ?

চষার সময় হয়ে গিয়েছে, এখন রোয়ার সময়। হাঁটু-ডোবা জলে দাঁড়িয়ে সাদতালি গাছ পোঁতে। হঠাৎ কি একটা কামড়ে দিলে তার ডানার উপর।

পাটের দড়ি দিয়ে আর সবাই শক্ত করে বাঁধন দিয়ে দিল। তবু ঢলে পড়ল সাদতালি। ধরাধরি করে নিয়ে এল তার বাড়িতে। বললে, কালে কেটেছে।

ওঝা ডেকে আনতে হয়। কাঁটালতলার চান্দু ওঝা। কিন্তু কে ডাকতে যাবে ? ডাকতে গেলেই গাল-গলা জুড়ে খেতে হবে এক থাবড়া। ঐ থাবড়াতেই নাকি বিষ নেমে যাবে অর্দ্ধেক।

কিন্তু কে থাবড়া খাবে " থাবড়া খেয়ে টলে ঘুরে পড়বে মাটিতে ? তা ছাড়া, দেখছ না, গাঁজলা উঠছে। ঠাণ্ডায় খেয়ে যাচ্ছে গা। কি হবে ওঝাকে ডেকে ? স্বয়ং বত্তিরাজেরও আজ সাধ্যি নেই।

সবাইর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল লালমালা।

আমি যাব। লাফিয়ে উঠে বললে মকরম। তিন-চার বাড়ি থুয়ে মুছুল্লিদের বাড়িতে হালিয়ার কাজ করে। রাখোয়ালি করে। উনিশ কুড়ি বছরের ছোকরা।

ওঝা এল। মাতব্বরি করে বললে, বাঁধন যখন খোলা হয়নি

তখন নামিয়ে দিতে পারবে বিষ। প্রথমে কতগুলো মুরগি মারলে। শেষে হাতের আঙুলে পায়ের আঙুলে পাটের দড়ির শক্ত বাঁধন দিয়ে টানতে লাগল গরুর বাঁটের মত। কাপড়ের ডগায় শক্ত গেরো বেঁধে বাড়ি মারতে লাগল মাথার উপর। শলা গরম করে এনে ছেঁকা দিলে শুধু দংশনের জায়গায় নয়, বুকে পিঠে ' মন্তর পড়ে-পড়ে।

তবু সাদতালির হুঁস হয়না।

মকরমের হাতে বাঁশি দেখে ওঝা বললে, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি? বাঁশি বাজা।

কেন, আমি বাঁশি বাজাব কেন? হাতের বাঁশি পিছন দিকে লুকিয়ে ফেলল মকরম, আমি কি গুণী?

না হোস, আমার মন্তরের জোরে গুণ পাবে তোর বাঁশি। বাজা।

বয়ে গেছে মকরমের। বাজাতে হলে বাজাবে সে মধ্যরাতে, ভরা রাতের জোয়ার আসবে যখন। যখন জোনাক রাতের ফিনকি ফুটবে। যখন সকলে ঘুমিয়ে থাকলে পরে বৃষ্টি নামবে নির্জনে। তখনই তার বাঁশির গুণ।

তার সাপ খেলাবার বাঁশি, সাপের বিষ নামানোর নয়। চড় খেয়ে ওঝা এনে দিয়েছে, ওঝা এখন কেরামতি দেখাক। বাঁশির সে জাত খোয়াতে পারবে না।

মববেই যখন, বাঁধন খুলে দে সাদতালির। ওঝা ভঙ্গ দিলে। বাঁধন কি একটা? অষ্ট পাশে বাঁধা। কে অতক্ষণ খোলে বসে-বসে। সকালে যখন মাটি দিতে হবে তখন না হয় সবাই আসবে আরেকবার।

তিরবিরে আঙুলে বাঁধন খুলতে লাগল লালমালা। এই বাঁধন খোলার মাঝেই বাঁশির ডাক।

বাঁচলাম। সাদতালি নড়ে-চড়ে এঁকে-বেঁকে উঠল। সর্বগায়ে বিষের মত ব্যথা।

কে বললে কালে কেটেছে? দাঁতের দাগ দেখেছে কেউ, দুই দাঁতের দাগ? কামড়েছে হয়ত পোকামাকড়, কিংবা হয়তো জলঢোঁড়া, আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধন বেঁধে বেঁহুস করে দিয়েছে তাকে। তারপরে শরীরের উপর এই দুরন্ত জোরজুলুম। গরম লোহার ছেঁকা, কাপড়ের গিঁটের বাড়ি, অকারণ টানাহেঁচড়া। এ কী দৌরাত্ম্য! খাড়া হয়ে সাদতালি নালিশ করবে ঠিক, খেসারত আদায় করবে।

তুমি যে বেঁচে উঠেছ এই আমাদের অনেক। আমাদের আর কী চাই? লালমালা বলে উঠল বেভুলের মত।

বেঁচে উঠবে না তো কি! কী ওস্তাদ ওঝা এই চান্দু গাজী। তার মন্ত্রের গুণের কথা কে না জানে। তারপর গাঙের পারে ঐ এখন বাঁশি বেজে উঠেছে না? চান্দু বলে যায়নি, বাঁশির সুরে তার মন্ত্র এসে ভর করবে? বাঁধন খোলার মন্ত্র?

ফর্সা না হতেই গৃহস্থি কাজে বেরিয়ে এসেছে লালমালা। লেপাপোঁছার কাজ। গরু-বাছুরের খেজমত। পাতাকুটো কুড়িয়ে আনা।

কোথায় কী কাজ? বাউরি বাতাসে মাথার কেশ এলো করে লালমালা বসে রইল পৈঠার উপর।

সামনেই মকরম। বাসি উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে। হাতের বাঁশি কোমরে গোঁজা।

হাবাতে হালিয়া একটা। বেকার বাউণ্ডুলে। খেতে পরতে কিছু নেই। নেই এক ক্রান্তি জমি, মাথা গোঁজবার আস্তানা। কিন্তু

বাঁশি কি বলে, বাঁশির ব্রজবুলি! ঘর-দোরের ঠিকানা জানায়, না জমি-জিরাতের হদিস দেয়?

'লালী।' বাঁশির সুরে ডেকে ওঠে মকরম।

দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠে লালমালা। বলে 'চলে যা। মন যে এখনো বান্ধা আছে।'



মাস্টার সাহেব

'কার ছেলে তুই ?'

'বঙ্কু পালের ভাগ্নে আমি। নাম বদ্যিনাথ।'

গাঁয়ে নতুন দেখছে ছেলেটাকে। সাত আট বছর বয়েস। চোখ দুটো চকচকে।

'লিখতে পড়তে পারিস ?'

বুদ্ধিতে ভরা কালো চোখ দুটো বোকা বোকা হয়ে গেল। প্রশ্নটাই অজানা, আজগুবি।

বঙ্কুকে গিয়ে ধরল ইয়াদালি। তোমার ভাগ্নে এল কবে ?

'বোনটা মারা গেল, নিয়ে এলাম নিজের কাছে। পাঁচ কাজে জোগানদার হবে। গরু রাখবে। দ্যাখশুন করবে বাড়ির কাজকাম।'

'ইস্কুলে দিতে পার না ?' ইয়াদালি মাষ্টার চেয়ে থাকে এক দৃষ্টে।

গলার স্বরে তিরস্কার নেই, অনুনয়। চোখের চাউনিতে রাগ নেই, মিনতি।

এ বলে কী মাষ্টার সাহেব ? বঙ্কু মুখ ফেরায়। বলে, 'গরিবের পোষায় কি এত বাবুয়ানকি ?'

বাবুয়ানকি কে বললে ? এ তোর ডাল-ভাত, তোর বেপার-

বাণিজ্য। তোর নতুন মহলের দিয়া-বাতি। বাতি জ্বেলে শুধু ঘর আলো করবি, মন আলো করবিনে? দেশ আলো করবিনে?

গা জল করা কথা। কিন্তু জিগগেস করি মাইনে লাগে না মাস-মাস?

মোটে আট গণ্ডা তো পয়সা। ক্ষেমাঘেন্না করে দিয়ে দিবি। একদিন না হয় জন দিবি এর জন্যে। কিন্তু আখেরে কী ফল পাবি ভেবে ছাখ। তোর ভাগ্যে একদিন বোর্ডের কেরানি হবে, সাহেবের মুহুরি হবে, আদালতের চাপরাশি হবে।

'আমার হাতে দিয়ে দে তোর বস্তিনাথকে।' মাষ্টার সাহেব আরেকবার ভিক্ষে চায়: 'আমি ওকে মানুষ করে দি। জঙ্গলের বাঁশ কেটে বাঁশি বানাই।'

চাষামানুষ, অকারণে ক্ষতিখরচ করতে পারব না। শুধু টাকার ক্ষতি? সময়ের ক্ষতি না? বক্কু পথ দেখে।

কিন্তু ওর নামটা খাতায় থাকতে তো দোষ নেই?

তা লিখে রাখ না খাতায়। পয়সা না লাগলেই হল। সরকারী খাতায় নাম উঠবে সে তো ভালো কথা, মানের কথা।

ভদ্দর আলির বাড়িতে নতুন গলার সোর উঠেছে। বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে বোধ হয় একটা। ঘর-পাড়া এক করছে চেঁচিয়ে।

বাড়ির মুখোরে বাজে-মালের দোকান ভদ্দরের। খদ্দেরের অভাবে চুপচাপ বসে আছে ভদ্দর। শাদা শুকনো রশুনের মত মুখের চেহারা।

'কবে হল?'

'কাল রাতে।'

'কার?'

'ছুটু বিবির।'

'কী?'

'মেয়ে একটা।'

ছেলে শুনবে মনে প্রাণে আশা করেছিল ইয়াদালি। ছেলে হলে আশা করতে পারত তার ইস্কুলে এসে পড়বে একদিন। তার হাতের জাদুতে বাঁশ থেকে বাঁশি হয়ে যাবে।

মুখ ছোট হয়ে গেল ইয়াদালির। যেন বুকের ভিতরটা কে-চেপে ধরল এক মুঠে। ছেলে হলে নামটা অন্তত লিখে রাখতে পারত খাতায়। না, বানানো কথা নয়, খোঁজ নিয়ে দেখে এস গে ভদ্দর আলির ছোট ছেলেই এই শামসের আলি।

চারদিকে পাটখড়ির বেড়া, বয়রা বাঁশের খুঁটির উপর গোলপাতার ছাউনি। দীঘলদির পাঠশালা। তেপায়া চেয়ার, ইঁট সাজিয়ে বাকি পায়া গাঁথা হয়েছে। তড়কা-ধরা চমকে-ওঠা টেবিল। খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে লম্বা তক্তার ফালি বেঁধে বেঞ্চি। নীচু ক্লাশের ছাত্রের জন্যে মাটির উপর কেওয়া পাতার হোগলা বিছানো। এক কোণে একটা আগুনের তাওয়া। তামাক-টিকে রাখবার জন্যে মাটির ডিবে। মাটির কলসের গলা-কাটা মাথায় হুঁকোর বৈঠক।

মন ভাল নেই ইয়াদালির। ছেলেরা বিশেষ কেউ আসেনা ইস্কুলে। আজ ঘনবর্ষা, কাল ব্যামো পীড়া, পরশু খেতের খেজমত। একটা না একটা কিছু লেগেই আছে হর-দিন।

'সব দিন ইস্কুল খোলার দরকার কি?' ছেলের বাপেরা চিপটেন ঝাড়ে: 'মাষ্টার সাহেবের না হয় কাজ নেই, কিন্তু আমাদের ছেলেরা ষোল আনা খাটনি না দিলে আমরা ষোল আনা দাম পাব কি করে?'

রেজেষ্টারিতে না-আসা ছাত্রের নামই বেশি। অন্তত চল্লিশ জন না হলে গ্র্যাণ্ট পাওয়া যায় না। তাই ছাত্র খুঁজে বেড়ায় ইয়াদালি। অন্তত ইস্কুলটা ত চালু থাক। ছাত্র বেতনের ঘাটতির দরুন তার মাইনেই না-হয় কাটা যাক, কিন্তু তার চোখের থেকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন যেন না উৎখাত হয়।

ইয়াদালির মন ভালো নেই। ইস্কুল বুঝি আর চলে না।

'আজ রব্বানের পালা। দে তো ভালো করে সেজে।' ক্লান্তের মত বলে ইয়াদালি।

তালপাতার উপরে নল খাগড়ার কলম দিয়ে ক খ গ লিখছে কটা ছেলে। দিশি কুমোরের তৈরি তিন-ছেঁদাওয়ালা মাটির দোয়াত। হাঁড়ির তলার ভুষো গুলে কালি হয়েছে। লিখছে আর মুছছে তেনার পুঁটলি দিয়ে।

বসে বসে জাল বুনছে ইয়াদালি। মন ভাল নেই। 'মড়া' ভাঙতে ভুল করে ফেলছে। স্বপ্নের জাল বুনছে মনে মনে।

ফুটো চাল দিয়ে জল পড়ে। ভাঙা বেড়া দিয়ে হি হি করে হাওয়া ঢোকে। কেঁচো বিছে সাপখোপের মজলিশ। হোগলা-মাদুর ভিজে ওঠে মাটির নোনায়।

বছরে ষাট টাকা মোটে সরকারী সাহায্য। ছাত্র-বেতন থেকে মাষ্টারের মাইনে। তাগিদের পর তাগিদ, ছ-মাসী সাহায্যটা এখনো এসে পৌঁছুল না। সেই সাহায্য দিয়ে ইস্কুলের ঘর ছাইবার কথা,

বেড়া মেরামত করার কথা। যদি সত্যি পৌছুত, ইয়াদালি ছাইত তার নিজের ঘর, মেরামত করত তার নিজের বেড়া। মাচা বাঁধত শোবার জন্যে। ধার শুধত মুদিখানার।

হালেমা কেঁদে ককিয়ে ওঠেঃ 'শুতে পারি না আর সেঁতো মাটিতে। বাছার গায়ের জ্বর আর মুছছেনা গা থেকে। শীতের চেয়ে বর্ষায় যেন বেশি কষ্ট।'

'সরকারী টাকাটা শিগগিরই এসে যাবে।' ইয়াদালি সোজাসুজি বলে, 'তখন পাটখড়ির বেড়া বদলে বাঁশের বেড়া করব। মাচা বাঁধব। মহাজনের খাতায় উশুল দেব। বার্লি-সুজি কিনব ছেলের জন্যে। ডাকব ডাক্তার-কবরেজ।'

'সরকারী টাকা তো ইস্কুল-খরচের জন্যে। ও টাকায় তুমি হাত দাও কি করে?' হালেমা চোখ বড় করে তাকায়।

কিন্তু কি করব বলো। আমার কি করে চলে? ছাত্রবেতন আদায় হয় কই? কত ঘোরাঘুরি কত সাধাসাধি, এক আনা দু আনা করে দেয়। আমি যেন ভিক্ষে চাইছি দোরে-দোরে। যেন দায়ে-ঠেকায় জড়িয়ে আছি সবাইর কাছে। লেখাপড়া শিখে তোদের ছেলেরাই লায়েক হবে, আমার কি! আমাকে চিনবেওনা বড় হয়ে। শুকনো একটা আদাব পর্যন্ত দেবেনা।

যেন জুলুমবাজ মহাজন গেছি তাদের বাড়ি এমনি ভাব কারুর-কারুর। কেউ ভাবে যেন অপরাধ করেছি সমাজের কাছে। আমি যেন তলবী আসামী। কাঁচা-খেকো ডাকাত।

আরে, হলে, তোদের ছেলেরাই মেম্বর হবে, মন্ত্রী হবে, আমি যে মাষ্টার সে মাষ্টারই থেকে যাব। আমি আর কি চাই? বড় জোর

চ্যাটাই ছেড়ে কাঁচা বাঁশের মাচা একখানা। তাও আমার জন্যে নয়। ছেলেটার বড় জ্বর।

তবু উপুড়হস্ত হবে না কেউ।

আর এমন মজা, বেশি চাপচুপও দিতে পারিনা। বেশি চাবকালে ঘোড়া বিগড়ে যাবে। বেশি কস্‌টালে নেবু যাবে তেতো হয়ে। তাই না? ছেলেরা যদি ইস্কুল ছেড়ে চলে যায়, তবে আমি যাই কোথায়?

'তাই ঠিক করেছি এবার সরকারী টাকা পেলে সংসারে লাগাব।'

'চুরি হবে না?' ঝামটে উঠল হালেমা।

হয়তো হবে। ইয়াদালি মাথা নিচু করল। যে টাকা ইস্কুলের বরাতী তা দিয়ে ইস্কুলের মেরামতি করতে পার কিন্তু মাষ্টারের মেরামতি চলবে না। মাষ্টার যেন ইস্কুলের সাজপাটেরও সামিল নয়। সে টুল-বেঞ্চির চেয়েও তুচ্ছ।

দরকার নেই ও-সবে। তুমি অন্য কাজ দেখ।

অন্য কাজ! বলে কি অবোধ মেয়ে! এর চেয়ে আর বড় কাজ আছে কি সংসারে!

'আমার আর কি কাজ। আর সবাই নিজের কাজ করছে, আমি দেশের কাজ করছি।' ইয়াদালি তাকিয়ে রইল দূরের দিকে।

দেশের কাজ নয় তো কি। বন্ধ দেয়ালে ফোকর ফোটাচ্ছে, মরা মাটির বাতিতে ছোঁয়াচ্ছে প্রথম আগুনের শিখ। সে-ই সিঁড়ি তৈরি করে দিচ্ছে, তারপর ঘসটে-ঘসটে উঠবে সবাই উচ্চ পদে।

কিন্তু তোমার নিজের সংসার? এযে টুমটাম করেও চলবার নয়। তোমার হাঁড়ি যে ঠনঠন করছে। রোগে-রোগে যে নাকাল হয়ে গেলাম।

'কাজ আবার কি!' হালেমা আবার ঝংকার দেয়। 'অন্যকে মানুষ করছ, নিজে মানুষ থাকবে না?'

ও! সে মানুষ হয়ে নেই। সে মাষ্টার হয়ে আছে। যে মাষ্টার সে মানুষ নয়। যে অন্যকে মানুষ করে সে নিজে মানুষ থাকে না।

'তার চেয়ে হাল গরু নিয়ে চাষ করলেও ভাল ছিল। তু মুঠো মুখে দিতে পারতাম।'

কিন্তু এ কত বড় কৃষি কাজ! প্রজা-চাষী করে কি? চাষ করে, জমিতে সুফল ফলায়। তেমনি আমিও আবাদ করছি; বলতে পারো, কাঠির আবাদ। কাঠির আবাদ জানো না? গোড়কাঠির আবাদ। একেবারে মূলের জঙ্গল কেটে জমি তৈরি করা। একটা ঘনঘোর জঙ্গলকে চাষবাসের উপযুক্ত করে তুলছি। আর এ শুধু এক আধ কানি নয়, সমস্ত দেশ। শুধু এক ডাকের পথ নয়, সমস্ত ভবিষ্যৎ।

দিনে তারা দেখছ তুমি। পনেরো টাকা মাইনের ইস্কুল মাষ্টার, তার লম্বাই-চওড়াই শুনলে গা জ্বলে। তার চেয়ে জুব্বর শিকদার যে কেরানি রাখবে বলেছিল সেখানে কাজ নিলে অনেক আসান হত। মাসে তিরিশ টাকা মাইনে দেবে বলেছিল। তুনো আয় হত সংসারের। এমনি করে সর্ব্বনাশের লিষ্টিতে চলে যেত না সবাই।

'এ মাষ্টারির মাথায় ঝাড়ু মারি। এর চেয়ে কেরানি অনেক ভদ্দর। দেখতে তো বটেই, শুনতেও।'

পোষ্ট মাষ্টার ষ্টেশনমাষ্টারকেও লোকে মাষ্টার সাহেব বলে। আর তাকেও বলে মাষ্টার সাহেব। ইয়াদালি নিজের দীর্ঘশ্বাসে চমকে উঠল হঠাৎ। মুখে হাসি এনে ভাবলে, কার সঙ্গে কার তুলনা।

একজন আছে ডাক নিয়ে, আরেকজন গাড়ি নিয়ে। আর সে আছে জল-জীয়ন্ত টাটকা মানুষ নিয়ে। ডাক একখানে গিয়ে পৌঁছোয়, গাড়ি একখানে গিয়ে থামে। কিন্তু তার ছেলের দলের থামা নেই কোথাও। তারা চলেছে এক জীবন থেকে আরেক জীবনে, এক পৃথিবী থেকে আরেক পৃথিবীতে। ইয়াদালির কাজ, ইয়াদালির বাঁচা সেই জন্ম-না-পাওয়া নতুন পৃথিবীতে। বীজ থেকে যে গাছ জন্মাচ্ছে সেই গাছের বীজাঙ্কুরে।

একটা ধাক্কা খেল ইয়াদালি। 'শোনাশুনি বুঝিনা আমি, দেখাদেখি বুঝিনা।' হালেমা রাগে ঝলসাতে লাগল : 'আমি বুঝি ভাত-কাপড়, আমি বুঝি মাথার উপরে চাল আর মাটির উপরে হোগলা। না, তুমি এ সব ছেড়েছুড়ে শিকদার সাহেবের দরবারে গিয়ে দাখিল হও। সাধা চাকরি বিলিয়ে দিওনা।' এবার কেঁদে ফেলল হালেমা : 'আমি দুটো পেট পুরে খাই, ছেলেটা একটু ওষুধ-পথ্য পাক, এ কি তোমার অসাধ?'

ঝিম মেরে রইল ইয়াদালি। স্ত্রী-পুত্রের কান্নার চেয়ে দেশের কান্নাটা কি বেশি করুণ? কোথায় তার দেশ? ইয়াদালি তাকিয়ে রইল শুকনো চোখে। ফাঁকা-ফাঁকা লাগতে লাগল।

সন্দেহ কি, জুব্বর শিকদার শাঁসালো লোক। তার শাক-পাতাড়ে দিন কাটে না। মাঝে-মধ্যে কোর্মা পোলাউ ওড়ায়। তার তেজালো তেজারতি আছে। জমি আছে গা-ঢালা। খাঁ-সাহেবির জন্যে আদা-জল খেয়ে লেগেছে। উঠন্ত বড়লোক সে।

জুব্বর শিকদার ইয়াদালিকে রাখতে চায় নিজের চাকরিতে। মাষ্টার আছে থাক, তার উপর তার কারবারে এসে লেখাপড়া ও

হিসাবকিতাবের কাজ করুক। চেকমুড়ি আর জমা খরচ। আমদানী আর তলববাকি। বাড়িতে মাষ্টার পোষা সম্ভ্রমের কথা। তাতে গেরস্তর মান বাড়ে, সহরৎ বড় হয়। হেঁজিপেঁজি নয়, স্বয়ং মাষ্টার সাহেব তার হিসাব লেখক। দস্তি-ক্রান্তির চুক হবেনা কোথাও। মাগনা খাওয়া, মাইনে পাবে ডবল।

'এমন কাজ কে না নেয় শুনি? টাকার তালাস থাকতেও এমনি জব্দ থাকব আমরা? কেউ থাকে?'

'তুই জানিস না, এমনি করে ও আমার জাত মারতে চায়।'

'যার ভাত নেই তার আবার জাত কি?'

না, ও আজ খাতা লেখাবে, শেষে একদিন বলবে, গরু বাঁধো, মাঠে ডেলা ভাঙো, লাঙল ঠেল, বাজার সওদা করো। ধর্মহানি ঘটিয়ে অসার কাজে লাগিয়ে দেবে। মাষ্টার ছিলাম, বানিয়ে দেবে দপ্তুরি।

এ আমি শুধু জমার হিসেব লিখছি—জমাখরচের নয়। কেননা আমার হিসেবে শুধু জমাই আছে, খরচ নেই। কার ঘরে কতটুকু জমা করতে পারলাম তার হিসাব। জীবনের রাস্তাঘাটে কে কতটা খাই-খোরাক জোগাড় করতে পারল। আমি শুধু আদায়-তশিলের একুন কষছি। ক্রমশই আমার দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বড় হচ্ছে।

দেশ নয় তো কি! ও সব হতমূর্খদের নিয়েই তো দেশ। এত মূর্খ, পড়ে কি হবে তা পর্যন্ত বুঝতে শেখেনি। ধরে-বেঁধে সাধসাধনা করে ইস্কুলে ডেকে আনতে হয়। একদিন আসে তো আধ দিন কামাই করে। জিগগেস করে জানো, মাঠে গেছে। মাঠে নয় তো আছে সংসারিতে। ইস্কুলে আসা যেন শ্বশুরবাড়ির মন

রাখতে আসা। তা যদি বা আসে মাইনের বেলায় ঢু ঢু। যত বাধা-ঠেকা যেন ইয়াদালির।

হ্যাঁ, ইয়াদালিরই তো বাধা-ঠেকা। নইলে এদের বোঝাবে কে, কোথায় এদের ভালো, কোথায় এদের জোর। জঙ্গল কেটে পত্তন করার ভার তো আল্লা তাকেই দিয়েছেন। একজন না কষ্ট করলে বহুজনের কষ্ট দূর হবে কি করে? মাটি না কাটলে ডহর হবে কি করে?

এত বড় কথা বুঝতে পারে না হালেমা। রাজি নয় বুঝতে। সে গোসা করে, দাপাদাপি করে, শেষকালে নাস্তানাবুদের মত কাঁদে।

'যাই দেখি, দেনা কর্জ পাই কি না।' ইয়াদালি উঠে পড়ে: 'চাল নুন বাড়ন্ত হয় তো বল, কিছু উদ্ধার করে আনিগে।'

অঘাটের পাড়াগাঁ, কালে-ভদ্রেও কেউ আসে না টোপ মাথায়। কেউই খবরাখবর করে না। রাজার বাড়ির মানুষেরা অন্য রাস্তায় আনাগোনা করে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন টোপ মাথায় ইনস্পেক্টর সাহেব এলেন।

অভাবিত্রে প্রত্যাশিত অতিথি। কত ভোর রাতের স্বপ্ন।

ছুটো কলাগাছ পুঁতেছে ইয়াদালি, কঞ্চি খাটিয়ে দেবদারু পাতার চাঁদনি করেছে। জালছড়া সরিয়ে ফেলেছে, গা ঢাকা দিয়েছে হুঁকো কলকি ডিবে বৈঠক। কিন্তু ছেলেরা কই? ছেলে বিশেষ জোগাড় হচ্ছে না। কেউ বলে শার্ট-কাপড় নেই, কেউ

বলে প্রশ্ন শুধুলে পারব না কিছু বলতে, কেউ বলে মাইনে দিইনি শুনলে জরিমানা করবে। কেউ বলে, বাড়িতে বড় লণ্ডভণ্ড।

অসম্ভব। এত কর্ম ছেলে দেখলে ইনস্পেক্টর সাহেব তেড়ে-ফুড়ে চলে যাবেন গাঁ ছেড়ে। এত দিনের পথ-চাওয়া টাকা-কড়ি কিছুই মিলবে না। ইস্কুল গোশালার সামিল হবে।

জামা-কাপড় নেই তো সাহেব দেখুক আমাদের দুর্দশা। প্রশ্ন করলে না পারিস, তোর দোষ কি? বলবি শেলেট-বই কেনবার পয়সা কোথায়? মাইনে দিতে পারিসনি তাতে লজ্জা কিসের? লোকে মাগগির বাজারে তেল-নুন কিনবে না মাষ্টারের মাইনে জোগাবে? বাড়িতে বিপদ বুঝি, কিন্তু ইস্কুল যদি না থাকে তবে দেশের কত বড় বিপদ বল দেখি। তোদের মাষ্টার না থাকে না থাক, কিন্তু তোদের ইস্কুলটাকে বাঁচা।

খাতিরদারি কর ইনস্পেক্টর সাহেবকে।

উপেন কুলুকে বলেছিল তেল পাঠাতে, গুপী গয়লাকে দুধ-দই। সবেদাৎ মুন্সিকে মাছ, সাহাবুদ্দিনকে মুরগি আর নুরু পেয়াদাকে পেঁয়াজ-রশুন। তোরা নিজেরা যদি না আসিস না এলি, শুধু মাল পাঠিয়ে দে। যদি ইনস্পেক্টর সাহেবকে খাওয়াতে পারিস পেট ভরে, ইস্কুলটা থাকে, আঞ্জাম-সরঞ্জামের ব্যবস্থা হয়।

হ্যাঁ, হালেমাই সব পাকাতে পারবে। জীবনে এই উপলক্ষ্যে যদি একদিন একটু ভালো-মন্দ খাওয়া হয়, হালেমার জিভ সড়সড় করে।

'হ্যাঁ, খুব পারব আমি। কেন পারব না? খেতে জানিনা বলে কি রাঁধতেও জানিনা?' হালেমা কোমরে আঁচল জড়ায়।

সাহেবের খানাপিনার জন্যে ইয়াদালিকে ব্যস্ত হতে হবে না। তার জন্যে লোক আছে। হ্যাঁ, উঠন্ত বড় লোক শিকদার সাহেবই আছেন। কে না জানে, এই গ্রামের ওঠা-নামা সব তাঁরই মাতব্বরিতে। এত বড় সমারোহ কাজ আজ, তিনি কি চুপ করে বসে থাকতে পারেন?

প্রকাণ্ড আদাব ঠোকে জুব্বর শিকদার। বলে, 'গরিবের দুয়ারে রাজপুরুষ এসেছেন, গরিব কি খায়-দায় দেখে যাবেন নিজ চক্ষে।'

কোর্মা-পোলাউ কালিয়া-কাবাব মিঠাই-মিষ্টান্ন—রেকাবের পর রেকাব, পরাতের পর পরাত। সাহেব হাসেনও না, কাঁদেনও না, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েও থাকেন না। শুধু খান, খেয়ে চলেন। খাওয়ার পর পানদানের উপর নজরানা পনেরো টাকা।

'এ কি?'

'হুজুর, রেওয়াজ।' জুব্বর শিকদার কোমর-ভাঙা বিনয়ের ভঙ্গি করে: 'নতুন অতিথি এলে তাঁকে নজরানা দিতে হয়। না দিলে তাঁর অপমান, আর অতিথি যদি না নেন তা হলে বাড়িওয়ালার অপমান।'

চমৎকার নিয়ম তো। উপায়ান্তর না দেখে সাহেব টাকাটা পকেটে গুঁজলেন। বাড়িওয়ালাকে তিনি বেনালে ফেলতে রাজি নন।

কিন্তু আসল মতলব কি জুব্বরের? নিজের ছেলেকে গুরু-ট্রেনিং এ দেবে নাকি? ইনস্পেক্টরকে সাক্ষী মানবে নাকি দেওয়ানি মামলায়? না, ইয়াদালির প্রতি আক্রোশে ইস্কুলটাকে গোল্লায় দেবে?

ইনস্পেক্টর সাহেব ঘুমুচ্ছে আর দরজার বাইরে ঠায় বসে আছে ইয়াদালি। ছাত্রের জন্যে বসে থাকে, এখন বসে আছে ইনস্পেক্টরের জন্যে। কতক্ষণে ঘুম ভাঙে।

ঘুম থেকে উঠে মনে পড়ল সাহেবের : ও, একটা ইস্কুল দেখবার কথা ছিল বটে। কদ্দুর ইস্কুল? ঐ যে দু'খানা মাঠ পেরিয়ে।

তবু লুঙ্গি ছেড়ে প্যাণ্ট পরবার চাঞ্চল্য নেই সাহেবের। বেলা গড়িয়ে পড়েছে। গা টিস্ টিস্ করছে।

'ছেলেরা এসেছে সবাই?'

কি করে আসবে! এলেও এতক্ষণ বসে আছে নাকি?

'কি করে আসবে বলুন।' ইয়াদালি অন্য পথে গেল : 'চাল উড়ে গেছে, বেড়া ভেঙে পড়েছে, বসবার জন্যে তক্তা গিয়েছে পচে। সরকারী গ্র্যাণ্ট পাইনি ক মাস।'

'সে কি কথা?' সাহেব ধমকে উঠলেন : 'সদরে যান না কেন বিল ভাঙ্গিয়ে আনতে? বিল-কেরানির সব দিক সব সময় খেয়াল থাকে নাকি? তাকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিতে হয়। একেবারে কোনো আক্কেল নেই আপনাদের।'

'কে বিল-কেরানি?'

'ঐ যার মাথায় চুল নাই একগাছাও—দেখেননি অফিসে? আপনাদের কথা ভেবে ভেবেই যার চুল সব উঠে গেল। তার কাছে গেলেই রফা হয়ে যাবে একটা।' ইনস্পেক্টর সাহেব তাকালেন জুব্বরের দিকে : 'আচ্ছা শিকদারসাহেব, আপনি তো ব্যবসাদার মানুষ, আপনিই চালিয়ে দিন না ইস্কুলের মেরামতি খরচাটা?'

জুব্বর শিকদার দাড়িতে হাত বুলুতে লাগল। বললে, 'হুজুরের হুকুমের জন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি এক পাশে। কিন্তু ভাঙা ঘর মেরামত করতে যাই কেন? আমি নতুন ইস্কুল করি, নতুন ইমারত। আপনি যদি সহায় থাকেন—'

'নিশ্চয়। খুব ভালো কথা।' ইনস্পেক্টর মুরুব্বিআনার সুর ভাঁজলেন: 'আর জানেন তো, স্কুলও একটি ভাল ব্যবসা।'

যা ভয় করেছিল ইয়াদালি। মুখ-চোখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললে, 'একটা ইস্কুলই চলে না, তায় আরেকটা!'

'না না, ও ইস্কুলের বদলে নতুন ইস্কুল করব। খোল নলচে কলকি সব বদলে দেব আগাগোড়া।'

'মাঝখান থেকে আমার কাজটুকু যাবে।' নিঃস্বের মতো শোনাল ইয়াদালিকে।

'না না, তা হবে কেন?' ইনস্পেক্টর সাহেব ঝাঁজিয়ে উঠলেন: 'মাষ্টার সাহেব তো থাকবেনই, নতুন আরেক জন সেকেণ্ড মাষ্টার নেয়া হবে।'

'আমি তো কাজ বরং দিতে চাই, নিতে চাই না।' জুব্বর শিকদার গলা দরাজ করল: 'আমার আমলে মাষ্টার সাহেবের মাইনে বাড়বে বই কমবে না। আর দেখবেন কত ছেলে ধরে নিয়ে আসি। সত্যিকারের বেদিয়া না হলে কেউটে ধরবে কে? মাষ্টার পারে পড়াতে, ছেলে জোগাড়ে সেক্রেটারি।'

একটা পাকা বাড়ির বড়-সড় কোঠায় ছেলে ঠাসা ক্লাশ বসেছে, সুর করে পড়ছে তারা পদ্যপাঠ, ধারাপাত আর শুভঙ্করী। ইয়াদালি তখন আর মাছ ধরার জাল বুনছে না, বুনছে ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল।

নতুন ইস্কুলের পাকা বাড়ি আদ্ধেক উঠতে না উঠতেই জুব্বর শিকদার খাঁ-সাহেবি পেল। আর খাঁ-সাহেবির মাতব্বরিতে ইস্কুলের গ্র্যাণ্ট মঞ্জুর করিয়ে আনলে। দুই মাষ্টারের মাইনে, তার উপরেও একমুঠ সরঞ্জামী খরচ।

জুব্বর শিকদার কথা-খেলাপের মানুষ নয়। ইয়াদালিকেই সে বহাল করলে হেড মাষ্টার। সেকেণ্ড মাষ্টার খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাচ্ছে না মনের মত। যদ্দিন না পায় দুজনের কাজ একাই চালিয়ে নিতে পারবে ইয়াদালি।

'এবার সত্যি সত্যি মাষ্টার সাহেবের মতন দেখাচ্ছে।' হালেমা ঢল ঢল করে ওঠে: 'শুনতেও ঠিক শোনায়—মাষ্টার সাহেব।'

খুসি না হয়ে উপায় নেই ইয়াদালির। তার মাইনে বেড়েছে। আগে পেত পনেরো, এখন তিরিশ। ডবল মাইনে দেবে বলেছিল জুব্বর শিকদার, কথা রেখেছে ঠিকঠিক। ব্যবসায় বসে সে বেইমানি করেনি। হালেমা দুই হাতে স্বচ্ছলতার ছোঁয়া পাচ্ছে।

কিন্তু ছাত্র কই?

নতুন আইনে ছাত্র-বেতন নেই। বিনি খরচায় পড়তে পারবে তারা। মাষ্টারের মাইনে আঞ্জাম-সরঞ্জামের খরচ সব আসবে সরকারী তবিল থেকে। ছেলেরা শুধু দয়া করে পড়তে আসবে। খাজনা-জরিমানা নেই বলে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারবে তাদের বাপ-চাচারা।

অথচ তাদের কারু দেখা নেই। নিকটে-দূরে কণ্ঠের একটা রেখাও কোথাও শোনা যায় না।

মজা মন্দ নয়। মাষ্টার আছে ছাত্র নেই। সেক্রেটারি আছে কমিটি নেই। ইস্কুলের নাম আছে, বাড়ি নেই।

না, নতুন ইস্কুল-বাড়ি আর উঠল না। জুব্বর শিকদার বলে, গ্র্যাণ্ট একবার পেয়ে গেছি, কি হবে আর বাড়ি তুলে? ব্যবসাতে সাজ-খরচ যত কম লাগে ততই লাভ।

ছয় পাট দেয়াল গাঁথা হয়েছে, অমনি থাক। চাল-ছাপ্পর হয়নি, দরজা-চৌকাঠ হয়নি—আসবে কেন ছেলেরা? কোথায় আসবে? তার চেয়ে মাঠে ঘাটে গরু চরিয়ে হাট-বাজার করে বিড়ি-তামাক ফুঁকে সংসারের তারা সুরাহা করুক। কারু পক্ষেই কোনো খরচ নেই। আমাদের কাগজ-কলমের ইস্কুলে তাদের কাগজ-কলমের দরকার হল না। জুব্বর শিকদার খোলা মনে হাসতে থাকে।

কিন্তু একদিন যখন বেরিয়ে যাবে জারিজুরি?

কিচ্ছু তোমার ভয় নেই, মাষ্টার। এই অজ গাঁয়ে, এই অঘাটের বন্দরে কেউ আসবে না। আর যদি কেউ আসেও, এমন খাইয়ে দেব এমন ভেট-বেগার দেব যে ঘুমিয়ে পড়বে, গা ঢিস ঢিস করবে, ইস্কুল দেখবার কথা আর মনেও আনবেনা। তুমি কেন ঘাবড়াচ্ছ বলো তো? তোমার চাকরি তো বজায় আছে। ইস্কুল চলুক কি না চলুক, ছেলে-ছাত্র আসুক কি না আসুক, মাস-অন্ত তোমার মাইনে পেলেই হল।

মাইনে পাচ্ছ তো, এবার এস একটু ইদিকে। শিকদার সাহেবের একটু গোমস্তাগিরি কর। খাতা লেখ। ম্যানেজারি চালাও। বোকার মত বসে-বসে শুধু জাল বুনো না।

পুরোনো দোচালা ইস্কুলটা ঝরে পড়ে কবে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

নতুন ইস্কুলের ইমারত পড়ে আছে কাঁথরি হয়ে। তবু বসে-বসে জাল বোনে ইয়াদালি।

ছেলেরা আসছে দলে-দলে, জমি-জায়গা ভেঙে, পুকুরের পাহাড়ের উপর দিয়ে। হাতে তাল-পাতা, নল খাগড়ার কলম, তিন ছেঁদাওয়ালা দোয়াত। রাতারাতি ইমারত তৈরি করে ফেলছে তারা।

জুব্বর শিকদার ইয়াদালির মাথায় ঝাঁকি মারল: 'কি, ঘুমুচ্ছ নাকি সকাল বেলা? যাও, সদরে যাও, বিল আসেনি এ মাসের। যাও, পাশ করিয়ে আনো গে।'

হ্যাঁ, নিজের গরজেই যেতে হয় ইয়াদালিকে। নিরিবিলি বুঝে টেকো বিল-কেরানির টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়।

গুনে-গুনে টাকা বুঝে নেয় ইয়াদালি। কিন্তু হিসেবে কোথাও একটু ভুল থেকে যাচ্ছেনা?

কোন হিসেবে?

বা, সেকেণ্ড মাষ্টারের মাইনে? বিলে এই যে ধরা আছে দেখছি।

টাক পর্যন্ত হেসে উঠল বিল-কেরানি। বললে, 'ওটা আমাদের, মানে, এ পক্ষের প্রাপ্য।'

প্রতি মাসে টাকা হাতে পেয়ে নিজের অজানতে হেসে ওঠে হালেমা। যা সে চেয়েছে, বড় গাছের আশ্রয়ে নৌকোর কাছি জড়িয়েছে তারা। শিকদার সাহেবের চাকরি করছে ইয়াদালি। কিন্তু ইয়াদালির মন ধূ ধূ করে। ঘুম আসে না।

'তবু আমাকে এখনো লোকে মাষ্টার সাহেব বলে।' জাল বুনতে বুনতে ঘর হারিয়ে ফেলে ইয়াদালি।

'বলবে না কেন? নদী শুকিয়ে যায় কিন্তু তার নাম মরেনা।'

বিড়ি

তামুকের উপর ট্যাকসো বসেছে।

তবু এক ছিলিম না খেয়ে নিলে নয়। দা-কাটা তামাকের সঙ্গে রাবগুড় মিশিয়ে গোল্লা বানিয়েছে দলিলদ্দি।

'এক কলকে তামুক সেজে দাও আলির দাদি। বড় তাড়াতাড়ি, একফুঁয়ে ধরিয়ে দেওয়া চাই।'

কিন্তু শান্তির দিন কি আর আছে? ভাত খেয়ে উঠে আছে কি আর তামুক খাওয়ার সুসময়?

এক নৌকোতে চলেছে অনেক জন। কেরায়া নৌকো। দখিন থেকে দিলদরিয়া হাওয়া দিয়েছে। বাদাম তুলে দিলে তরতরিয়ে চলে যাবে দেখতে দেখতে। বেতিখালের মধ্যে দিয়ে।

সব চেয়ে বেশি তাড়া হোসেন মোল্লার। সেটলমেণ্ট ক্যাম্পে সে তিন-ধারার দরখাস্ত লেখে। প্রত্যেক মুসবিদায় দু-আনা চার-আনা মজুরি পায়। আর সব সমন-ধরানো সাক্ষী। ফৌজদারির আর আদালতের। বটতলায় বাস, ভাড়াটে সাক্ষী আছে একজন। খাজনার মামলায় একতরফা জবানবন্দি করে। কানে খড়কে-গোঁজা আছে একজন মুহুরি।

মেখেজুখে খাবার একটু সময় নেই। সময় নেই হুঁকোর দুটো

সুখ টান দেয়। বাদাম খুলে এখুনি বেরুতে না পারলে ঠিক সময়ে পৌঁছুনো যাবেনা শহরে।

'নেন, বিড়ি নেন।' বাঁশের চুঙার মধ্যে থেকে বিড়ি বার করে দিল আলির দাদি।

হ্যাঁ, বিড়িই তো আছে। হুঁকোর চেয়ে অনেক কড়া, অনেক টিক-খর। এক টানেই চাঙ্গা করে তুলবে। তুর্কি তাজির মত। এখন শহরে যাচ্ছে, বিড়ি-ই তো থাকবে তার পকেটে। তার তামুকের সার। সারালো তামুক।

না, পকেটে নয়। বিড়ি কটা দলিলদ্দি রাখল তার ট্যাঁকে গুঁজে। অন্তরঙ্গের মত, গায়ের চামড়ার সঙ্গে। গায়ের জামাটা পর-পর মনে হয়। মনে হয় বাইরে, দূরে-দূরে।

দিয়াকাঠি কই? বাক্সে মোটে আছে দু তিনটে। ও থাক। আলির দাদির লাগবে সন্ধেরাত্রে। যখন আখা ধরাবে। চেরাগ দেবে পীরের মাজারে। দলিলদ্দির লাগবে না। কারু থেকে চেয়ে-চিন্তে নেবেখন।

আগে বলত বারিকের মা। এখন বলে আলির দাদি। বারিক মারা যাবার পর। বারিকের কবিলা যখন নিকা বসে তখন আলিকে দলিলদ্দি নিয়ে যেতে দেয়নি। হোক মা তার স্বাভাবিক অভিভাবক, আসলে সে-ই তার ভুঁই-সম্পত্তির অলি-অছি। আর ছেলে-মেয়ে নেই, নাতিটুকুই তার শিব রাত্তিরের সলতে। তার পীরের দরগার পিরদিপ।

'আমি যাব শহরে।' আলি লাফিয়ে উঠল।

হ্যাঁ, তেমনি কথা আছে বটে। এবার যখন যাবে দলিলদ্দি, আলিকে সঙ্গে নেবে। শহর দেখে আসবে সে। লাল সুরকির

রাস্তা, টিনের ঘর, পাকা দালান, হর-কিসমের দোকানপসার। দেখবে ইস্কুল আদালত। দারোগা দেখেছে সে, এবার নিজের চোখে দেখে আসবে এজলাসের হাকিম।

তাই না রে আলি ?

পাঁচ-ছ বছরের ছেলে। পরনে ছোট ডোরাকাটা লুঙ্গি। গায়ে কুর্তা। চোখ ডাগর করে হাসে। বলে, 'শহরে গিয়ে রসগোল্লা খাব, ফজলি আম খাব, আর—'

আবার তাড়া দিয়ে উঠল হোসেন মোল্লা।

নাতিকে নিয়ে নায়ে উঠল দলিলদ্দি।

'এ কি, নাতিকে নিয়ে চলেছ কোথায় ?'

'শহরে।'

'সেখানে ওর কী ?'

'দেখে আসুক একটু সোরসার। আইন-আদালত চিনে আসুক নিজের চোখে। জমিজিরাতে ওরই তো ওয়ারিশি, বুঝে নিক আপন গণ্ডা। জবরান যে দখল করে তাকে কি করে উচ্ছেদ করতে হয় শিখে নিক তার ঘাঁতঘোঁত।'

'এখুনি শিখবে কী, নয়া মিয়া ? এখনো বুঝজ্ঞানই হয়নি।'

'না হোক। কিন্তু রক্তে ওর তেজ লাগুক। নিজের জমি জমা রক্ষা করার তেজ।'

মুহুরিবাবু দিয়াশলাই দিলেন। একটা বিড়ি ধরাল দলিলদ্দি। দু' টানেই আঁট-করে-বাঁধা ধনুকের গুনের মত শরীরটা টন-টন করে উঠল। আমা ইট ঝামা হয়ে উঠল। বিড়িটা চালান দিলে পাশের সোয়ারীকে। পাঁচ আঙুল জড় করে মুখে পুরে বিড়িতে টান দিলে

সে ছোঁয়া বাঁচিয়ে। হাত-ফিরতি দিলে আরেকজনকে। আঙুলে ঠোঁট লাগিয়ে সেও টান দিলে চুকচুক করে। ঘুরতে ঘুরতে শেষ টানের জন্যে এল আবার দলিলদ্দির হাতে। লম্বা টান দিতে গেল দলিলদ্দি। বিড়িটা নিবে গেল। শুখা নেই আর, শুধু পাতা। ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীতে।

দূরের পথ নয়। আধ ভাটা সই লাগে। আদালতের প্রথম হাজিরার ডাক পড়বার আগেই এসে পড়েছে তারা।

আর সবাই হোটেলে খাবে। খাক। তারা সাক্ষী, তাদের গুমর কত। তাদের খাওয়া-খরচ চাই, বারবরদারি চাই। না, আমরা ঠিক আছি, আমাদের জন্যে ভাবনা নেই। আমরা দাদা-নাতিতে খেয়ে এসেছি এক পাতে। দরকার হলে নায়ে না এসে হাঁটা পথে চলে আসতে পারত তারা। তারা সাক্ষী নয়, তারা পক্ষ। তারা বাদী।

স্বত্ব সাব্যস্তের মামলা। উচ্ছেদপূর্বক খাসদখল।

ব্যাপার কী? ব্যাপার খুব সোজা। সাধারণ।

কানি তিনেক বাপের আমলী জমি ছিল দলিলদ্দির। তার মধ্যে প্রজার মুখে এক কানি। বাকি জমি ছিল খাসে, নিজ লাঙলে। জমি-জায়গার সঙ্গে সঙ্গে বাপ কিছু কর্জ-দেনাও রেখে গিয়েছিল। সাদা খত আর কটকবালা। দেনার দায়ে, পেটের দায়ে বিক্রি হয়ে গেল খাস জমি। এখন প্রজাপত্তনী আছে শুধু এই এক কানি। ধানকড়ারী জমা। খাজনা শুধু দশ মণ ধান। অভাবে, বাজার-দর। বাজার যতই সুবিধের হোক তা দিয়ে সংসারপুষ্টি চলে না। পারে না চলতে।

দলিলদ্দির ইচ্ছে করে কোনো ছুতোয় জমিতে নেমে আসে।

সে খাজনা চায় না, সে জমি চায়। মুনফা চায়না, চায় মাটি। আসল-ফসল। খাস জমি সব খোয়া গেছে, এখন আছে শুধু এই প্রজাই জমিটুকু। তার জমি, অথচ তার নয়। সাধ্য নেই দখল করে, আঁকড়ে ধরে বুকের মধ্যে। যেন মা পড়ে আছে শূন্য ভিটেয়, সন্তান রয়েছে দেশান্তরী হয়ে।

দলিলদ্দির মধ্যস্বত্ব। হাওলা। সবাই তাকে হাওলাদার সাহেব বলে। বলে জমিদার। অথচ এদিকে সে বর্গা চষে, বাজার-বেপার করে, মন্দা পড়লে সোজাসুজি জন খাটে। জমিদারি চায় না সে, সে জমি চায়।

কিন্তু এক্রাম আলিকে সে কি বলে উচ্ছেদ করবে? এক্রাম আলির রায়তি স্বত্ব। সন-সন সালিয়ানা সে খাজনা দিচ্ছে। জোর করে লিখিয়ে নিচ্ছে দাখিলা। এতটুকু ফাঁক দিচ্ছেনা যে একটা নালিশ ঠোকে দলিলদ্দি। আর নালিশ ঠুকলেই বা কি, ডিক্রি হবার আগেই টাকা জমা করে দেবে আদালতে। ডিক্রি মকস্মল করে দেবে।

চিরকাল থাকতে হয় বুঝি এমনি পরের জমিতে চাকরি করে। খাটনা খেটে। এঁটোকাঁটা খেয়ে।

গা তেতে-পুড়ে যায় দলিলদ্দির। এমনি সাফ-সুতরো বিক্রি করে দিত, বাস, ভাবতে পারত, চির জন্মের মত চলে গিয়েছে স্বজন-বান্ধব। যে মরে যায় তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় কি করে? যদি বাঁধা থাকত, জায়সুদি বা খাইখালাসি, ভাবতে পারত, মেয়াদের মধ্যেই ছাড়িয়ে নিতে পারবে কোনোরকমে। তবু আশা থাকত, না মরা পর্যন্ত রুগীর যেমন আয়ু থাকে। কিন্তু এ কী বেদলিলী কাণ্ড! তার বিয়ার বউ যেন ঘর-গৃহস্থি ফেলে রেখে পরের বাড়িতে গেছে

আমোদ-আহ্লাদ করতে। গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে দলিলদ্দির। বুকের মাংস খাবলে নিয়েছে কে—সে-ঘায়ে খাজনার মলম লাগাচ্ছে ফোঁটা-ফোঁটা।

যুদ্ধ এল। ওলোট পালোট হয়ে গেল সব। এক্রামালি কিস্তি খেলাপ করলে। এক কিস্তি নয়, পুরো এক সন। কিন্তু সটান তখুনি আর্জি করতে পারল কই দলিলদ্দি? কি করে পারবে? তার হাওলা-স্বত্ব সে অভাবের দায়ে বিক্রি করে দিয়েছে আহম্মদকে।

আহম্মদ বড় হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। মাটি থেকে উঠে আসতে চাচ্ছে উপরে, লাঙল থেকে লাটদারিতে। সে এখন মান চায়, মুনফা চায়, চায় উপরের স্বত্ব। সে হতে চায় উপর তলার বাসিন্দে।

নালিশ ঠুকল আহম্মদ। আশ্চর্য, এক্রামালি জবাব পর্যন্ত দিলে না। এক তরফা ডিক্রি হয়ে গেল এক ডাকে।

ব্যাপার কী? খবর নিয়ে জানল, এক্রামালি ভেগে পড়েছে। কোথায় গেল? আর বোলো না। গ্রামে যুদ্ধের আড়কাঠি এসেছিল, টাকা পয়সা ও রাঙা মেয়ে মানুষের লোভ দেখিয়ে সেপাই-সাহেবের চোপদার করে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে জমি সে সরাসরি ইস্তফা দেয়নি। জমির উপর বসিয়ে গেছে কোলরায়ত। তার সতাই ভাইর শালা। নিজের ধর্ম-জামাই। নয়ন খাঁ।

জমি-বিক্রির টাকা এক দমকে খরচ করে ফেলেনি দলিলদ্দি। পুষে রেখেছে তুষের আগুনের মত। আহম্মদের ডিক্রিজারিতে সে এসে নিলাম কিনলে, বকেয়া বাকি বেশি ছিল না, পারলে নিলাম কিনতে। আহম্মদের জমি খাস করার ইচ্ছে নেই, সে চায় প্রজা, সে চায় খাজনা। তার হাওলার নিচে রায়ত। এক্রামালিই হোক,

যা হোক দলিলদ্দি। দলিলদ্দি চায় জমি জায়গা, ভিত-বনেদ। ফৌতফেরার হয়ে থাকতে চায়না। চায় জমির কাছে ফিরে যেতে। তার নিজের মায়ের কোলে।

নিলাম কিনে আদালতের পেয়াদা নিয়ে বাঁশগাড়ি করে দখল নিলে দলিলদ্দি। কিন্তু খাস দখল পায় কই? কোত্থেকে নয়ন খাঁ এসে হাল তাড়িয়ে দিলে। বললে, ভাসা চর নয় যে লাফিয়ে পড়বে। আমি আছি এখনো।

তুমি কে?

আমি দায়ধারী। এই দেখ পত্তনপাট্টা।

মনে মনে হাসল দলিলদ্দি। সেলামি নিয়ে এক্রামালি তার ধর্ম-জামাইকে ঠকিয়েছে এক চোট। পাকা পোক্ত কোনো স্বত্বই হয়নি নয়ন খাঁর। তাসের ঘরে বাসা নিয়েছে সখ করে। দায় রহিতের একটা নুটিশ নিলেই উড়ে যাবে এক ফুঁয়ে।

তার কিনা এত চোট! জোয়াল থেকে খুলে দেয় গরুর কাঁধ। কই কাকুতি মিনতি করে বলবে, প্রজা স্বীকার কর নয়া মিয়া, উলটে কিনা হামি হয় জমির উপর। বলে, দায়ধারী!

দায় এবার বিদায় নেবে এক দৌড়ে। প্রজা স্বীকার করবে না হাতি। এত কষ্টে এত দিন বসে থেকে জমির একবার দেখা পেয়েছে, আর তাকে সে ছাড়বেনা। ঠাণ্ডা মাটিটার উপর উদলা বুকে পড়ে থাকবে।

গাজুরিতে দরকার নেই। দলিলদ্দি গেল উকিল সাক্ষাতে। উকিল বললে, দায় রহিতের এক নুটিশ জারিতেই নয়ন খাঁ কাটা পড়বে।

হল নুটিশ জারি। কিন্তু নয়ন খাঁ তবু হটে না।

তাই এবার স্বত্ব সাব্যস্তের মামলা। স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্বক খাস দখল।

আদালত গিসগিস করছে। অনেকে এসেছে শুধু জবানবন্দি শুনতে আর হাঁ-না মাথা বাঁকাতে। কোন সাক্ষী কী কেলেংকারি করে, কার কী কেচ্ছা বেরোয় তার মজা পেতে। রেলিঙের বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর্দালি-চাপরাশি তাড়িয়ে দিলে তাদের হাতে পয়সা গুঁজে আবার এসে ভিড় বাড়ায়।

নয়ন খাঁ পাট্টা শুধু নিজের নামে নেয়নি, তার বোনের নামেও নিয়েছে। হয়তো এই বোনের ঠেঙেই সেলামি পেয়েছিল সে। উকিল বললে, সেই বোনের নামে নুটিশ কই? দলিলদ্দি হাসল। বললে, নুটিশ জারির আগেই সে-বোন মারা গেছে। সোয়ামী মারা যাবার পর চলে আসে ভায়ের সংসারে। নিকা বসবারও সময় পায়নি।

যাক, বাঁচা গেল। নয়ন খাঁরও তেমনি তদবির, বোনের কথা কিছুই বলেনি বর্ণনায়। তবু সেই বোনের কথাই উঠল দলিলদ্দির জেরাতে।

'বোন মারা গেছে কবে?'

'নুটিশ জারির পূর্বে।' ঘাড় সোজা রেখে বললে দলিলদ্দি।

'তা হোক। বোনের মরা আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু তার আছে কে?'

'কে আবার থাকবে! পুরুষ তো আগেই মরে গিয়েছিল। থাকবার মধ্যে আছে শুধু এই ভাই নয়ন খাঁ।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ছেলে পিলে ছিল?'

'তা ছিল বৈ কি—'

দলিলদ্দির উকিল এখানে আঁ-হাঁ-হাঁ করে উঠল টেবিল, থাপড়াল, উঠে দাঁড়িয়ে বিরুদ্ধ পক্ষের প্রশ্নে অনেক প্রতিবাদ করল। তবু মূর্খ দলিলদ্দি কোনো ইঙ্গিতই বুঝতে পারল না। 'ছিল' পর্যন্ত বলেছিল, এখন বললেই পারে যে সে-ছেলেও মরে গেছে। এখনো পড়তে-পড়তে বেঁচে যেতে পারে। বোকাটা হাসছে মিষ্টি-মিষ্টি। সত্য কথা বলার আরাম পাচ্ছে।

'সে ছেলে কই ?' জিগগেস করলে বিপক্ষের উকিল।

'বেঁচে আছে। বাড়িতে আছে। নাম চান্দু। আমার নাতি আলি আজিমের বয়সী।'

তবে আর কী! কচু পোড়া খাও গিয়ে। চান্দুর স্বত্ব তা হলে ধ্বংস হয়নি। আর তবে পাবে কি করে খাসদখল ?

কাঠগড়া থেকে নেমে এল দলিলদ্দি। বারান্দায় নিয়ে উকিল তাকে চাবুক মারার মত করে ধমকালে। এমন অঘামারাও আছে তুনিয়ায় ? বর্ণনায় কিছু বলেনি, তুই কেন বলতে যাস গায়ে পড়ে ? ছেলে একটা ছিল বলেছিলি তাকে মেরে ফেললেই তো পারতিস এক কথায়। তাকে একেবারে জলজীয়ন্ত রেখে দিগি তোর নাতির সামিল করে।

দলিলদ্দির হাত-পা ছেড়ে গেল দেখতে-দেখতে। আদালতের বারান্দায় দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে পড়ল আচম্বিতে। চান্দুকে বাঁচিয়ে রাখার দরুন তার এই ঘোরচক্কর হবে কে জানত! সত্য বলতে গেলে এত শাস্তি! কেন, তার বলতে যাবার ঠেকা পড়েছিল কী! নিজের না সে নিজে ডোবাল ঘাটে এনে। আর, মুখের কথায়

মেরে ফেললেই তো আর মরে যেত না চান্দু। নিকা বসবার আগে আলির মা আলিকে কত মেরেছে আর বলেছে মরে যেতে। কিন্তু আলি কি তার জন্যে বেঁচে নেই ?

কিন্তু এখন হবে কী বাবু ?

আর হবে কী! নয়ন খাঁর কাছে থেকে খাজনা পাবে কোল-রায়তির। জমিতে খাস দখল পাবে না। মুঠ ধরে জমিতে লাশ টানতে পারবে না লাঙলের।

হাউ-হাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করল দলিলদ্দির। এমনি করে আনাড়ি আহম্মকের মত সমস্ত সে মেছমার করে দিলে! কী হত যদি চান্দুকে সে মেরে ফেলত এক কথায়! কী হত যদি চান্দুকে সে মেরে ফেলত এক কোপে!

আলি আরো ছোট্টটি হয়ে বসল দাদার গা ঘেঁসে। দাদার কিছু একটা দুঃখ-বিপদ হয়েছে এ সে বুঝতে পারছে আবছা-আবছা। কিন্তু কিছুই তার করবার নেই। সে শুধু দাদার গায়ে হাত রেখে আপনার জন হয়ে বসে থাকতে পারে চুপ করে।

ট্যাঁকে শুধু তিনটে বিড়ি আছে। একটা বের করে দলিলদ্দি দিলে তা আলির হাতে। বসলে, 'যা, পানের দোকান থেকে ধরিয়ে নিয়ে আয়।'

দাদার এই দুর্দিনে কোনো একটা কাজে লাগছে, আলি খুশি হয়ে উঠল। পানের দোকানে ঝুলছে ছোবার পোড়া দড়ি। তারই মুখে মুখ ঠেকিয়ে আলি বিড়ি ধরাল। কচি-কচি পাতলা ঠোঁটে চুক চুক করে টানলে কয়েক বার। ছোট্ট হাতের মুঠটি গোল করে বিড়িটাকে বাঁচিয়ে রাখলে। পাছে নিবে যায় মাঝ পথে ছোট্ট করে আরেকটা

টান দিলে চোরের মত। মাঝে-মাঝে ঠিক মত টান না দিলে বিড়ি কখন নিবে যায় আপনা থেকে।

ঠিক ধরিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে বিড়িটা। দলিলদ্দি হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে দু' আঙুলে। টানতে লাগল হু-হু শব্দে।

আর কি, এবার বিড়ি পাকাবে দলিলদ্দি। কোলের উপর কুলো নিয়ে বসবে। কুলোর উপর থাকবে শুকা আর পাতা, ছুরি আর কাঁচি, চা-খড়ি আর সুতো। আর টিনের একটা ফরমা-পাতা। প্রথম প্রথম এই ফরমার উপর বিড়ির পাতা রেখে কাটবে সে মাপসই করে, হাত ওস্তাদ হয়ে উঠলে লাগবে না আর ফরমা-পাতা। রকমারি সুতো বেঁধে-বেঁধে কদরের তেরফের বোঝাবে। সেঁকা বিড়ি, আসেকা বিড়ি, মুখপোড়া বিড়ি। কড়া, মিঠে আর ছ্যাঁকছেঁকে।

গাল-গলা ভেঙে চুপসে যাবে দলিলদ্দির। বেরিয়ে পড়বে পাঁজরা। কুঁজো হয়ে আসবে ক্রমে-ক্রমে। বিড়ির পাতার মত তার সারা গায়ে শির বেরুবে। কিন্তু হাত হয়ে উঠবে খরখরে। দিনে প্রায় হাজার-দুহাজার বিড়ি পাকাবে দলিলদ্দি। আর লাঙল চালাবেনা। কাঁচি দিয়ে পাতা কাটবে। ছুরি বা কাঠের কলমের ডগা দিয়ে মুড়বে বিড়ির মুখ।

না, অসম্ভব। খুব লম্বা করে শেষ টান দিলে দলিলদ্দি। ধোঁয়াটা বুকের মধ্যে ধরে রাখল অনেকক্ষণ।

তামুকের ঝাঁজে মরা রক্ত চনমন করে উঠল। খাড়া হয়ে উঠে বললে, 'চল ফিরে যাই।'

'কোথায়? বাড়ি?' আলির মুখ চুপসে গিয়েছে।

'না। বাড়িতে নয়।'

'তবে?'

অন্তরঙ্গের কাছে যেন গোপন কথা বলছে এমনি ভাবে গলা নামাল দলিলদ্দি : 'জমিতে। মামলার অত প্যাঁচঘোঁচ বুঝিনা আমরা। আমরা দাদা-নাতিতে মিলে আমাদের নিজ জমি দখল নেব জোর করে।'

বড় মনমরা হয়ে ছিল আলি। শহরে এসে কত কিছু সে খাবে ভেবেছিল, কত কিছু সে দেখবে। কিছুই তার ঘটে ওঠেনি অদৃষ্টে। সমস্ত দিন সে দাদার গা ঘেঁসে বসে রয়েছে। দুঃখের দিনের দিলাশার মত।

শুধু-শুধু বাড়ি ফিরতে হলে খুবই হতাশ লাগত আলির। জমিতে যাবে শুনে তার ফুর্তি হল। লাগল নতুন রকম। চোখ ডাগর করে বললে, 'তাই চল দাদু।'

কাউকে কিছু বললে না দলিলদ্দি। নাতির হাত ধরে চলে এল নদীর ঘাটে। একটা ডিঙি নৌকা ভাড়া করলে। বললে, বাড়তি একটা বৈঠা থাকে তো আমার হাতে দাও।

যেন দৈত্যদানা ভর করেছে দলিলদ্দির কাঁধে। তীরের মত ছুটিয়ে আনলে নৌকা। একেবারে জমির কিনারে।

আছরের অক্ত চলে গিয়েছে। আজ আর নামাজ পড়া হল না। আলির কানে কানে বললে, 'চলে আয়। এই মাটি-মাঠ ধান-পান সব আমাদের।'

'আমাদের? সব?'

'সমস্ত।'

আরেকটা বিড়ি ধরাবে নাকি দলিলদ্দি? না, এখন নয়।

আউশ ফলেছে জমিতে। পুরো পাকেনি এখনো। না পাকুক,

তাই কাটবে এবার দলিলদ্দি। নৌকোর মাঝির সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে। সে দিয়েছে কাঁচি এনে। যা সরাতে পারবে তার দশ আনা তার। জমির নিচে বাঁধা আছে নৌকো।

না, চুরি বোলো না। বলো, জবরান দখল নিচ্ছে সে তার নিজের জমি। হাওলা স্বত্ব ছেড়ে রায়তি-স্বত্বে সে নিলেম কিনেছে, এ জমিতে তার একার এক্তিয়ার। ঐ সব সুটিশ-টুটিশের ফিকির-ফন্দির সে ধার ধারবে না। পারে যদি নয়ন খাঁ গিয়ে আদালত করুক।

কাঁচি দিয়ে ধান কাটতে সুরু করল দলিলদ্দি। আর আলি নুয়ে-নুয়ে কাদাজলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে-ডুবিয়ে টানতে লাগল গোড়া ধরে।

তিন কানি ভুঁইর মাথায় নয়ন খাঁর বাড়ি। কলাগাছের হাউলি দিয়ে ঘেরা।

কে রে ধান কাটে?

যার জমি সে। রাজার আদালতে হারতে পারি কিন্তু খোদার আদালতে হারব না।

নয়ন খাঁরা পড়ল গিয়ে ল্যাজা-লাঠি নিয়ে। পালিয়ে গেল না দলিলদ্দি। উন্মাদের মত লড়াই করতে লাগল।

তারপর কী যে ঘটল, অনেকক্ষণ কিছু মনে নেই দলিলদ্দির। দেখল নৌকোয় করে কোথায় চলেছে।

ছই নেই নৌকোয়। ঐ যে লম্বা একটা বাঁশ দেখছ ওটা পাল খাটাবার কাঠ নয়, ওটা ল্যাজা। খাড়া হয়ে বিঁধে আছে দলিলদ্দির বুকে। লেগে ছিটকে পড়ে যায়নি, ঢুকে বসে গেছে। লোহার অংশ বেরিয়ে নেই কিছু বাইরে।

চলেছি কোথায় ?

আবার শহরে। হাঁসপাতালে।

আলি কোথায় ?

পিছনের নৌকোয়। তার লাগেনি বিশেষ। কপালের কাছটা শুধু ফেটে গিয়েছে।

হ্যাঁ, তাকে বাঁচা। তাকে ওষুধ দে।

দলিলদ্দি আবার নিঝুম হয়ে পড়ল। এখনো বেঁধা জায়গা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে ক্রমাগত।

না, এখুনি ঝিমিয়ে পড়লে চলবেনা। আলির সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলে যাওয়া দরকার। দাদুকে ফিরে না পাক, কিন্তু জমি তাকে ফিরে পেতে হবে, এই মন্ত্র দিয়ে যেতে হবে তার কানে-কানে। তার রক্তে সেই ঝাঁজ দিয়ে যেতে হবে। এখুনি তার নিবে গেলে চলবে না।

'ম্যাচবাতি আছে নাকি ?'

দলিলদ্দি ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করল। সঙ্গের লোকদুটোকে বললে, 'আমাকে একটু উঁচু করে তুলে ধর। আমি বিড়ি ধরাই।'

বুকে ল্যাজা গোঁজা, অন্যের গায়ে পিঠের ভর রেখে বিড়ি ফুঁকছে দলিলদ্দি।

হাঁসপাতালে যখন পৌছুলো তখনো দলিলদ্দির প্রাণ আছে।

আলি কোথায় ?

ঐ শুনতে পাচ্ছনা তার কান্না ?

হ্যাঁ আলির কান্নাই বটে। তার জখম হয়েছে কোথায় ?

কপালে। ফেটে হাঁ হয়ে রয়েছে। ডাক্তার বলছে সেলাই

করবে। তাই ভয় পেয়ে কাঁদছে ছোট ছেলে।

হ্যাঁ, কাঁদছে। দাত্থ-দাত্থ বলে কাঁদছে।

বা, কাঁদছিস কেন? লড়াই করতে হবে তোকে। কত প্রতিশোধ নিতে হবে। রক্তে রেখে দিতে হবে কত জন্মের রাগ। তোর ভয় পেলে চলবে কেন?

ল্যাজ্ম বের করে নিয়েছে বুকের। লম্বা ঘরের মধ্যে এক পাশে এক বিছানায় শুয়ে ধুকপুক করছে দলিলদ্দি। অবস্থা সঙ্গিন। এই আছে কি এই নেই।

বারান্দায় উঁচু একটা টেবিলের উপর আলি শোয়া। ডাক্তার অস্ত্র নিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে। তার কপালটা সেলাই করতে হবে। প্রাণপণে চিল-চেঁচাচ্ছে ছেলেটা।

সঙ্গের লোক ছুটোকে চিনেছে দলিলদ্দি। একটা ভিক্ষুক, একটা দাগী। একজনকে ইসারা করে কাছে ডাকলে। ট্যাঁক থেকে শেষ বিড়িটা বের করে দিল।

বললে, 'আলিকে দিয়ে আয়। বল দাত্থ দিয়েছে। যেন কাঁদে না। যেন ঠিকমত চিকিচ্ছে করে ভালো হয়। বাড়ি ফিরে যায়।'

'কাঁদিসনে আলি। এই দ্যাখ, তোর দাত্থ দিয়েছে।'

আলি চোখ ডাগর করে দেখল। একটা গোটা, আস্ত বিড়ি। এক চুমুক ধোঁয়া নয়, একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড। এক খোঁট কালি নয়, একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস। এক শিষ ধান নয় একটা প্রকাণ্ড ধানক্ষেত।

তার দাত্থ দিয়েছে।

আলি চুপ করল। তেজালো লোভে চকচক করে উঠল তার চোখ ছুটো।

সূর্যদেব

সবাই যাচ্ছে। হরিপদ কাবাসী, সাধু দালাল, জটিরাম কাহার। ফক্কর বক্স, মাতব্বর গাজি পর্যন্ত। মেয়েরাও আছে। নীরদা, কৃপাময়ী, সুভঙ্গবালা। ও-পাড়ার সাহেবের মা, ইংরেজের মা।

দিন থাকতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। পৌছুতে পৌছুতে প্রায় মাঝরাত। দলের সঙ্গে ছুটি মাত্র হেরিকেন। সাপ্লাই-ঘর থেকে শ্লিপ বের করে এনে কিছু তেল জোগাড় করেছে ভাগ্যধর।

'তেল তো একবার নিয়েছিস রেশন-কার্ডে।' বললে পাটোয়ার বাবু।

'সে তো ঘরে জ্বালাবার জন্যে। এ আলোটা আমরা পথে জ্বালাব। যাব সবাই হোসেনপুর ইষ্টিশানে। দল বেঁধে। আপনি যাবেন না?'

পাটোয়ার বাবু তবু গড়িমসি করছে।

'এ দেবে তোমার রিজার্ভ ষ্টক থেকে। ছ' বোতলের একটা শ্লিপ কেটে দেবে।' বললে লক্ষ্মণ বাগ। 'খয়রাতি নয়, দাম দেব। এতগুলি লোক যাচ্ছি আমরা তীর্থ করতে।'

তবু যেন পাটোয়ার বাবু ইতি-উতি করে। বাড়তি তেলের অনুমতি হবে কিনা তাই বোধহয় যাচাই করে মনে-মনে।

'তুমি কেমনধারা লোক গা?' ঝামটা মেরে উঠল বুড়ি রতন

দাসী। 'এমন দিনে বাড়তি ছ' বোতল তেল ছাড়তে পারনা তুমি? আমরা সবাই ঘর-বাড়ি ছেড়ে-ছুড়ে চলে যাচ্ছি, আর তুমি তোমার দোকান আঁকড়ে বসে আছ?'

'অত ফুটুনি কিসের?' বললে বাবুচরণ। 'কনট্রোল উঠে যাবে এবার।'

ছুই নয়, অনেক কষ্টে এক বোতল বাড়তি তেলের শ্লিপ কাটল পাটোয়ার। সেই তেল ছুই হেরিকেনে ভর্তি করে চললে তীর্থযাত্রীরা। কতক্ষণ পরেই উঠে আসবে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর চাঁদ।

'আমিও যাব। আমাকেও তোদের সঙ্গে নিয়ে চল।' বললে ঠাকুরদাস। বয়স সত্তরের কাছে, জীর্ণশীর্ণ অথচ সিধে শিরালো চেহারা, খালি গা, খালি পা, হাতে লাঠি, কোমরে জড়ানো ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো। কিছু নেই, জীবনে কোনোদিন কিছু পায়নি, তবু নবীন আশার বাতাস লেগেছে তার কুঁচকানো চামড়ায়। যেমন বসন্তের বাতাস লাগে নিষ্পত্র বৃক্ষশাখে। হাতে আর বেশি দিন নেই, তবু সেও যেন চায় একটি নতুন দিন।

'এত দূরের রাস্তা, তুমি যাবে কি করে?' বললে বাবুচরণ। 'তোমার নাতি কোথায়?'

'মনু? সে আজ কুড়ি-পঁচিশ দিন ধরে বিছানায় শোয়া। তার অসুখ।'

'তার অসুখ খুব বেশি।' বললে লালু, লালচাঁদ। বছর-দশেকের একটি রোগা-পটকা ছেলে। মনুর সমানবয়সী। সে এসে বুড়োর হাতের লাঠি চেপে ধরল। বললে, 'মনু না যাক, আমি আছি। আমি তোমাকে ঠিক নিয়ে যাব দাছু।'

বুড়ো ঠাকুরদাস হাসল। কাউকে তাকে নিয়ে যেতে হবেনা। জনহীন রাস্তায় একা হলেও সে ঠিক পথ চিনে নিতে পারবে আজ। সে আর বুড়ো নয়, নতুন করে সব আবার আরম্ভ হবে বলে সেও যেন ফিরে চলেছে শৈশবে।

কিন্তু দলের পাণ্ডা ভাগ্যধর আপত্তি করে। বলে, 'তুমি যাচ্ছ খামোকা। একদম মিছিমিছি।'

'বাঃ, মনুর জন্যে ধুলো নিয়ে আসব।'

'ধুলো?

'হ্যাঁ, সেই ধুলো বুকে-কপালে মেখে দিলেই মনু ভাল হয়ে উঠবে।'

সেই কথা মনুর মা সুফলাও বলে দিয়েছে বার-বার করে।

বলেছে, 'বাবা, আর কিছু না হোক, পথের থেকে কিছু ধুলো নিয়ে এস। গায়ে মাথায় মেখে দিলেই মনু আমার ভাল হয়ে উঠবে। আর ট্রেন যদি না থামে বাবা, তবে লাইনের ছোট একটা পাথরের কুচি কুড়িয়ে নিয়ে এস। মাদুলি করে গলায় পারিয়ে দেব মনুর।'

আগে কথা ছিল সুফলাই যাবে, ঠাকুরদাস থাকবে মনুর পাশটিতে। কিন্তু সুফলা যায় কি করে? বাইরে বেরুবার মত তার একটা আস্ত শাড়ি নেই। যা শীত, নেই একটা গায়ে দেবার মোটা কাপড়।

এমনি অনেক মেয়েই যেতে পারেনি ঘরে-ঘরে। কিন্তু পুরুষদের কথা আলাদা। তারা শীত-গ্রীষ্ম মানেনা, হুড়-দঙ্গলে তাদের ভয় নেই।

'কিন্তু তোমার যে শীত করবে, বাবা।' বললে সুফলা।

'রেখে দে।' ঠাকুরদাস এক হাসিতে সমস্ত শীত-বর্ষা উড়িয়ে দিলে। বললে, 'মাঝরাতেই আজ সূর্যি উঠবে শুনেছি। শীত-টিত কিছু থাকবে না।

বাবাকে বাধা দিতে যাওয়া বৃথা। বুড়োমানুষ, কতদিনই বা বাঁচবে। তবু মনু যখন ঘুম থেকে জেগে উঠে জিগগেস করবে, কেমন দেখে এলে মা, তখন কী বলবে সুফলা? তাই সে বারে-বারে বলে দিলে, ধুলো নিয়ে এসো। না পেলে পাথরের কুচি।

ঠাকুরদাস যখন যায়, জ্বরের ঘোরে মনু তখন বেহুঁস হয়ে আছে। সাঁঝরাতে তার ঘুম ভাঙল। বললে, 'মা, তুমি গেলে না?'

'না বাবা, তোমার দাদু গেছে।' সুফলা ছেলের পাশে ঘন হয়ে বসল। ক্লান্তিভরে চোখ বুজল মনু। বললে, 'একজন গেলেই হল।'

জ্বরটা আজ বেড়েছে। তাই মনু সব ঠিকমত বুঝতে পারছে না। তার মা না গিয়ে দাদু গেছে এতে তার কোনো নালিশ নেই।

অনেক পরে আবার চোখ মেলল মনু। বললে, 'ট্রেন যখন আসবে মা, বাঁশি শুনতে পাব?'

'রোজই তো শোনা যায়।'

'আজো শোনা যাবে, না? আজ নিশ্চয় আরো বেশি জোরে বাজাবে। আমি কি শুনতে পাব? যদি আমি ঘুমিয়ে থাকি তখন?'

'তোমাকে জাগিয়ে দেব, মনু।'

'তাই দিয়ো, মা। আজ নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে বাঁশি দেবে। আমাকে জাগিয়ে দিয়ো মা। আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি শুধু বাঁশি শুনব।'

ফকিরালির জন্যেই বারে-বারে সবাইকে পিছিয়ে পড়তে হয়। ধমকে ওঠে ভাগ্যধর: 'তুই এসেছিস কেন? নেচে-নেচে হাঁটিস, তোর জন্যে শেষ কালে কি আমাদের ট্রেন ফেল হয়ে যাবে?'

'ল্যাংড়া মানুষ, তাই অমন চলি একটু নেচে-নেচে। তা তোমরা

এগোও না, আমি যতক্ষণে পারি পৌঁছুব গিয়ে।' বিরস মুখে বলে ফকিরালি। 'এখন না-হয় ঠাট্টা করছ, কিন্তু ফেরবার সময় দেখবে, খোঁড়া পা সিধে হয়ে গেছে, পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত ছুটে চলেছি টগ্‌বগিয়ে। আল্লা করেন, একবার যেন দেখা পাই।'

রাত নেমে পড়েছে। ভাগ্যধর আর আমিনদ্দির হাতে জ্বলছে ছুটি হেরিকেন। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কাঁচা মাটির রাস্তা ধরে চলেছে তীর্থযাত্রীরা।

এ-গ্রাম-ও-গ্রাম আশে-পাশের সমস্ত গাঁ-গেরাম ভেঙে পড়েছে। সকলের পথ আজ মিশেছে এসে হোসেনপুরের ইষ্টিশানের প্ল্যাটফর্মে।

প্ল্যাটফর্মে ধরছে না সবাইকে। লাইনের ছু'পাশে ছাপিয়ে পড়েছে। সব ফাঁকা ফরসা জায়গা ভরে গিয়ে এখন লোক ঝোপঝাড়, বন-জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছে। এক ইঞ্চি মাটি কেউ ছাড়ছে না।

একেক দল একেকটা চক্র তৈরি করে বসেছে। ছুটকো লোকেরা লাইন বেঁধে ; লাইন ভেঙে কে কখন আবার ছিট্‌কে পড়ছে তার ঠিক নেই। কাঠ-পাতা কুড়িয়ে আগুন করছে কেউ-কেউ। কেউ বসে বসে ঢুলছে ঘুমের ঘোরে। মশা কামড়াচ্ছে।

কতক্ষণে ট্রেন আসে তার ঠিক কি ? ভলন্টিয়ররা ঘোরাফেরা করছে, ভিড় সামলাচ্ছে, লাইন বজায় রাখছে। ট্রেনের চাকার তলায় কেউ ছিটকে গিয়ে না পড়ে তার খবরদারি করছে। চেঁচামেচি, হৈ-হুজ্জতের শেষ নেই কোথাও।

'কত দেরি আর গাড়ি আসবার ?'

অনেক দেরি। প্রত্যেক ইষ্টিশানে এমনি ভিড় হচ্ছে। গাড়ি ছাড়তে পারছে না সময়মত। শিকল টেনে থামিয়ে দিচ্ছে বারে-বারে।

সবাইর ফিরতে ভীষণ দেরি হয়ে যাবে কাল। কাল হাট-বার। কত লোকের কত কাজ। কেউ যাবে বেপার করতে, কেউ যাবে সওদা করতে। এক হাট মারা গেলে কত ক্ষতি। কেউ ধান কাটতে কাটতে চলে এসেছে মাঠ ছেড়ে। কারু খামারে ফসল তোলা বাকি। কারু গরু-বলদ কামাই যাবে ভরদিন।

তা যাক। কেউ আর তার জন্যে গ্রাহ্যি করেনা। দেখতে-দেখতেই দিন-রাতের বদলে যাবে চেহারা। আর দুর্ভিক্ষ হবেনা। দুর্ভাগ্য থাকবেনা আর কারুর। তাঁতিরা সুতো পাবে, জেলেরা নৌকো। কাপড় আসবে গাঁটরি বেঁধে, ধানের মরাই খালি হবেনা কোনদিন। বকেয়া খাজনা মাপ হয়ে যাবে। জমি-জায়গা থেকে আর কেউ উচ্ছেদ হবেনা।

কর্তালোকেরা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছে সবাইকে ফিরে যেতে। কেন, কি হল? বলছে ট্রেন এখানে থামবে না। খবর এসেছে। সোজা চলে যাবে জংশন-ষ্টেশনে। এই শীতের মধ্যে বসে থেকে করবে কি। তার চেয়ে বাড়ি ফিরে যাও।

বাঃ, তা কি হয়? কত দূর-দূর থেকে এসেছে তারা, কত কষ্ট করে। কত খাল-বিল পেরিয়ে। এখন না দেখে এমনি-এমনি ফিরতে পারবেনা তারা। না, কিছুতেই না।

শোনো। তোমরা তো আর অবুঝ নও। প্রত্যেক ইষ্টিশানে এমনি ভিড় হওয়ার জন্যে গাড়ি প্রত্যেক ইষ্টিশানেই থামছে। তার জন্যে ওঁর ঘুম হচ্ছেনা, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়েছে। তোমরা কি চাও তোমাদের জন্যে ওঁর সাংঘাতিক কোনো অসুখ হোক?

সত্যিই তো, তা কি তারা চাইতে পারে?

তবে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যাও সবাই।

তাতে তারা রাজি নয় কিছুতেই। গাড়ি না থামে তো না থামবে। ছুটে চলে যাক তাদের চোখের সমুখ দিয়ে। যে ট্রেনে উনি যাচ্ছেন সেই ট্রেনটা তো অন্তত তারা দেখবে। শুনবে তো তার চাকার শব্দ। ইঞ্জিনের বাঁশি। ট্রেন দেখে মাটিতে নুয়ে নুয়ে প্রণাম করতে পারবে তো তারা।

'ছাই!' হতাশার ভঙ্গি করে বললে লক্ষ্মণ বাগ, 'দেখতে না পেলে বসে থেকে লাভ কি? ট্রেন দেখে কি হবে? ও কি আমরা দেখিনি? গাবতলার হাটে যেতে হপ্তায় দু'দিন আমরা ট্রেন দেখি। রাস্তার দু'মুখে আটকে রাখে আমাদের দরজা ফেলে।'

'নাই যদি দেখতে পাব কিসের জন্যে তবে সোরগোল?' বললে বাবুচরণ।

'মনে মনে দেখবি। মনে মনে দেখবি।' বললে ঠাকুরদাস, লালচাঁদের কাঁধে হাত রেখে। 'চোখের দেখাটাই কি সব?'

যা দেখবার, তা কি শোনা যায় না?

আর যা শোনবার তা কি দেখা যায় না চোখ মেলে? অন্ধকারে চেয়ে থাকতে থাকতে ভাবে ঠাকুরদাস। এমন কি কোনো অনুভূতি নেই যেখানে দেখা ও শোনা, ছোঁয়া ও শোঁকা সব এক হয়ে গিয়েছে? যদি না-ও থামে ট্রেন, তবে তার চাকার শব্দ ও ইঞ্জিনের বাঁশি শুনেই কি তাঁকে দেখা হয়ে যাবে না?

সিটি দিয়ে ঐ ট্রেন আসছে। হেড-লাইট জ্বালিয়ে। তার চাকার শব্দকে ডুবিয়ে দিচ্ছে আজ জনতার কোলাহল। জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

কারু চোখে আজ ঘুম নেই। আকাশের নক্ষত্রগুলো পর্যন্ত চোখ মেলে দেখছে এই গ্রামান্তের কম্পিত হৃদয়গুলোকে। মহাত্মাজীও ঘুমুতে পারলেন না।

দেখেছিস? দেখতে পাচ্ছিস? ঐ যে, ঐ যে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছেন। দেখতে পাচ্ছিস না? ঐ যে! এবার দরজা খুলে দাঁড়িয়েছেন স্পষ্ট হয়ে। শুনতে পাচ্ছিস না তাঁর কথা? বেজায় গোলমাল। শুনে কী হবে? ছাখ, ছাখ চোখ ভরে।

ঠাকুরদাস তন্ময়ের মত বললে, 'কেন, আমি তো ওঁর কথা শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট।'

কতক্ষণ পরে ট্রেন চলে গেল সিটি দিয়ে। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যার-যার গ্রামের পথ ধরল।

লালচাঁদ বললে, 'এই নাও দাছ্ পাথরের কুচি আর এই ধুলো। লাইনের ঠিক মাঝখান থেকে তুলে এনেছি।'

'এনেছিস? তোর মনে আছে তা হলে?' ঠাকুরদাস উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'মন্নু এবার নিঘঘাৎ ভাল হয়ে উঠবে। কী বলিস লালু, উঠবে না?'

'সবাই ভাল হয়ে উঠবে।'

গ্রামে ফিরতে ফিরতে প্রায় ভোর। সূর্য উঠি উঠি করছে। কুয়াশা করেছে চারদিকে।

লালচাঁদ চলে গেল তার বাড়ি, ছুতোর পাড়ায়। ঠাকুরদাস ডাকলে, সুফলা।

সুফলা দরজা খুলে দিল। শীত নেই, খিদে নেই, ঘুম নেই, ক্লান্তি নেই, ঠাকুরদাস যেন আরেকরকম লোক হয়ে গিয়েছে।

'মনু কেমন আছে?'

'রাত্রেই জ্বরটা ছেড়ে গেছে মনে হচ্ছে। যেই ইঞ্জিনে সিটি দিল, অমনি জাগাতে গিয়ে দেখলাম গায়ে তার জ্বর নেই।'

'ঘুমুচ্ছে মনু?'

'ঘুমুচ্ছে।'

আবছায়ায় হাতড়ে-হাতড়ে ঠাকুরদাস ঘরে ঢুকল। পূবের জানলাটা খুলে দিলে। বসল মনুর পাশটিতে। পাথরের কুচিটা তার মাথায় ঠেকিয়ে রেখে দিলে বালিশের তলায়। এক টিপ ধুলো নিয়ে ছুঁইয়ে দিলে কপালে।

মনু চোখ চাইল। প্রফুল্লকণ্ঠে বললে, 'দাদু! তুমি? তুমি এসেছ? কখন এলে?'

'এই তো।'

'দেখে এলে? দেখে এলে তাঁকে?'

'দেখে এলাম বই কি।'

'তুমিও দেখতে পেলে? ভারি আশ্চর্য তো।'

'হ্যাঁ, দাদু, ভারি আশ্চর্য। যে অন্ধ, যার চোখ নেই, সেও তাঁকে দেখতে পায়।' ঠাকুরদাসের দুই চক্ষুহীন কোটর থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল।

'কেমন তাঁকে দেখতে বলো না?' মনু অন্ধ হবার চেষ্টায় চোখ বুজল।

'ঠিক সূর্যের মতো। যেই এসে দাঁড়ান চারদিক আলো হয়ে ওঠে। ভয়ের, দুঃখের, বিবাদ-কলহের লেশমাত্র থাকেনা। বড় সুন্দর, বড় শান্ত রে দাদু।'

'তুমি দেখলে? সত্যি দেখলে?' মন্নু দৃঢ় করে চোখ বুজে রইল।

'কিছুই আমি দেখি না চারদিকে, তোর মুখখানা পর্যন্ত নয়। তবু তাঁকে আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম। কুয়াসা সরিয়ে হঠাৎ রোদের ঝলক দিয়ে উঠছেন যে এখন সূর্যদেব, ঠিক তাঁর মত। তুই চোখ বুজে আছিস কেন, দাদু? চেয়ে ছাখ। নতুন সূর্য উঠছে।'

মন্নু চোখ চাইল। দেখল কাঁচা সোনার রোদ্দুরে ঘর দোর ভরে গেছে। পাখি ডাকছে কত রকম কাকলীতে। মুক্ত, স্নিগ্ধ বাতাস বইছে ঝিরঝির করে। তার শরীরে আর জ্বর নেই।



দান

'ও কে ? ওর নাম কি ?'

খাতা লিখছিল সরকার। বট দত্ত। চোখ তুলে বললে, 'লাহিরি সেখ।'

মরাটে চেহারা। ছেঁড়া ধুকড়ি পরনে। এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন প্রাণটা টিমটিম করছে।

'জমি আছে ক বিঘে ?' দাবায় বসে হুঁকো খাচ্ছে মহাজন। যোগেশ সিঙ্গি। হাঁকার দিয়ে উঠল।

লাগানি-ভাঙানির দল আছে কাছে-ভিতেয়। বললে, 'এক ধুলও জমি নেই হুজুর। সব বিবিকে হেবা করে দিয়েছে।'

'তবে হবে না।' সরকার লাহিরিকে সরিয়ে দিল হাতের হাওয়ায়।

লাহিরি কুকুরের গলায় ককিয়ে উঠল। সে আর তার পরিবার কি আলাদা ?

নির্দিষ্ট তারিখ নেই মরবার, কেউ মাথা-মুরুব্বি নেই সংসারে, তাই আগুতেই জমি লিখে দিয়েছে। দেনমোহরের দায়ে। তাই বলে পরিবার কি তাকে পথে বসাবে ? না, ধানের কর্জ শোধ দেবেনা ওয়াদামত ? অভাবী বলে কি তারা এত অধার্মিক ?

কচাল-কচকচি করিসনে। যা, পরিবারকে নিয়ে আয়। সে এসে

মোকাবিলা করে দিক। দাদন হবে তার নামে। খাতকের ঘরে উঠবে তার নাম।

'তার বড় অসুখ।'

চলবে না ওসব টালবাহানা। আর, দলিল বেঁধে আনতে বলিস আঁচলে। দাগ-খতিয়ান মিলিয়ে নেব।

সত্যি বলছি, জ্বরে জ্বরে সে জেরবার হয়ে গেছে। বলতে-চলতে পারে না। বাতাসে হেলছে এমনি রোগা।

রাখ ওসব ছল-অছিলা। যার ধানী জমি আছে সেই পাবে ধান।

বড় অভাব পড়ে গিয়েছে দেশ-গাঁয়ে। খাই-খোরাকের অভাব। ভাদ্র মাসেই ভাত নেই।

হাঁটিয়ে-বসিয়ে টানা-হেঁচড়া করে বহু কষ্টে নিয়ে এসেছে মোহর-জানকে। এই দেখ দলিল। মুখস্ত দান নয় আমাদের। খুঁত-টুট নেই। মিথ্যে বলিনি। হাত বদল হয়নি আর, দায়সংযোগ করিনি কোথাও।

'তা হলে ধান কিন্তু তুমি নিচ্ছ, তোমার খসম নয়।'

'হ্যাঁ, আমি লিচ্ছি।' ছেঁড়া শাড়িতে আব্রু ঢাকা, বললে মোহরজান।

'শোধ না দিলে তুমি দায়ী হবে। তোমার জমি দায়ী হবে।'

'হব।'

'ক ধামা নেবে?'

'তিরিশ ধামা।'

ধান দাদন হচ্ছে। শতকরা পঞ্চাশ ধামা সুদ। মানে একশো নিলে লাগনা হবে দেড়শো। বেড়ে যাবে দেড়ে। নাম হল দেড়িবাড়ি। ধামার মাপ তিন সের।

খাতায় একটি মবলগবন্দি করে নাও। আঙুলের মাথায় কালির ধাবড়া। কাটান-ছিঁড়েন নেই।

না থাক। যতই কড়াক্কড় হোক, এখন তো বাঁচল। এখনই তো উড়ে-ঝরে নস্যাৎ হয়ে গেল না। স্বামী-স্ত্রীতে দোয়া করতে লাগল মহাজনকে। নিজেদের ক্ষুধার তাড়নায় বুঝতে চাইল না মহাজনের ক্ষুধা। যাতে পউষে ফলন ধরে অজস্র, মহাজনের দেনা শোধ করে দিতে পারে, তারই আরজ জানায়।

তারপর দেশে লাইসেনির আইন এল। ধান-দাদনেও লাইসেনি লাগে।

বড় ধরাকাট। বড় খিটকেল। অত বাঁধাবাঁধিতে যেতে পারব না বাপু। যেমন কলি তেমনি চলি।

'ও কে? ওর নাম কি?'

'ওর নাম কান্তি পদ্ধান। দেশে-গাঁয়ে মামলার তদবির করে বেড়ায়। অবস্থা পড়ে গেছে আজকাল।'

'জমি নেই?' লোভাক্তে চোখে জিগগেস করলে মহাজন।

ছামুতেই আছে সব লাগানি-ভাঙানির দল। বললে, 'হিজলের মাঠে জমি আছে তিন বিঘে। জলা জমি।'

হোক জলা, সেই তিন বিঘের জমিই তবে দিতে হবে। হ্যাঁ, সরাসর বিক্রি। মাঠে বাজার যা চলছে সেই দরেই কিনে নেব। বলি, ধান চাই কতটা?

নিদেন আট বিশ। কুড়ি মণ। পোষ্য-পাল্য অনেক।

জমির ঠিকানা কি? খতেন-পরচা দেখাও।

জমিটাকে জন্মের মত ছেড়ে দিতে হবে শুনে কান্তির বুকের মাংস

ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পড়ল। খাটতে পারা অবধি সেই জমিতেই সে চাষ করছে, তা ছেড়ে দেয়া মানে এক রাতের মধ্যেই পাহাড় ধোসে পড়া। হাত জোড় করে বললে, 'গোড়াগুড়িতেই না কাঙাল হয়ে যাই হুজুর। একটা ফাঁক-ফিকির কোথাও রাখুন যাতে জমিটা বজায় থাকে।'

তবে, বেশ, শাদা ষ্ট্যাম্প-কাগজের কানিতে সই করে দাও। হ্যাণ্ডনোটে দেড় টাকা করে ষ্ট্যাম্প। ওয়াদামত সুদসমেত ধান যদি না ফেরৎ পাই ঐ কাগজ আমি কবালায় বদলে নেব।

'আর যদি ফেরৎ দিই?'

'তোমার দস্তখতী শাদা ষ্ট্যাম্প-কাগজ ছিঁড়ে ফেলব কুটি-কুটি করে।'

কান্তি হাঁপ ছাড়ল। একটুকু আশা! একটুকু আয়ু! জমিটা তার বজায় থাকবে, বরবাদে যাবে না। মানী খানদানী লোক, ধান ফেরৎ পেলে জমি নিশ্চয় আর তনছট করবেনা। আলেখা দলিল নষ্ট করে ফেলবে।

কিন্তু ধান যদি ফেরৎ দিতে না পারে?

যখনকার কথা যখন। এখন তো ঘরগুষ্টি তার বাঁচল; অভাব-অভিযোগে ফৌত হয়ে গেল না। এখন তো কটা দিন হাওলাত-বরাতের থেকে রেহাই পাক। কান্তিও মহাজনকে আশীর্বাদ করলে।

তারপর দেশকে লক্ষ্মীছাড়ায় পেলে একদিন।

'কোথায় চললে হে বরকৎ?' বাণেশ্বর গনাই ডাক দিলে পাছু থেকে।

'পোদ্দারের গদিতে।'

'সেখানে কি?'

'আর সেখানে কি ! সোনা-রুপো আছে কতক, বাঁধা থুবো।'

ট্যারা পোদ্দার ভারি ফিকিরবাজ। কালে-কশ্মিনেও ছাড়ান দেবেনা। ময়াল সাপের মত গিলে ফেলবে। গোড়ায়-গোড়ায় হবে-হচ্ছে করবে, পরে একেবারে ন্যাকা সাজবে। বলবে, কিসের গয়না, কিসের কি ! খাতা কাগজের ধার ধারবেনা কোনোদিন।

'যে ডাল ধরি সে ডালই ভেঙে পড়ে। কি করব মশায় ?'

'জমি নেই ? এক আধ কেতা তাই বিচে দাও ক্যানে ?'

বরকৎ যেন ঘা খেল বুকের মধ্যে ! বললে, 'জমি পাশার শেষ দান। ঘটি-ঘড়া কাঁস-পেতল গেছে, এখন সোনা-রুপো। শেষ তাকাৎ জমি। আগে পেক-ফ্যাকড়া, শেষকালে শেকড়।'

যত দিন পারে জমির গায়ে হাত দেবেনা। যত দিন পারে গায়ের আঁচল করে রেখে দেবে জড়িয়ে।

কিন্তু পারল কই ? একধার থেকে জমি বেচা সুরু হয়ে গেল। গোডহর-গোচর-ভাগাড় পতিত-পুকুর পুকুর-পাহাড় কিছুই আর বাকি রইল না।

গাঁ-ঘরকে বাঁচালে যোগেশ সিং। ধান দিয়ে জমি কিনে কিনে। ঠকঠকে জমি দিয়ে কী হবে যদি সমূহ খেতে না পায় দু মুঠো ? টাকার তারা কেউ যাচনদার নয়, সবাই ভাতের কাঙাল।

জমি তাই সস্তা হয়ে গেল মাটির মত। ধুলোর মত।

কিন্তু এবারো, সবাই বললে ঐ এক কথা। বললে, 'সিঙ্গি মশাই আমাদের ধম্ম রাখলেন। ছোট লোকের মরদ আমরা, আর কিছু না বুঝি, ধম্ম বুঝি।'

তবু দেশে আইন এল বিপরীত। জমি-ফেরস্তের আইন।

ইংরেজের হল কি ? রাজ্যপাট লোপাট হবার দাখিল নাকি ? নইলে বলে কিনা আকালের বছরে পেটের দায়ে আড়াইশো টাকার কম পণে যারা জমি বেচেছে তাদেরকে জমি ফিরিয়ে দিতে হবে ! লম্বা, বছুরে কিস্তিতে উশুল পাবে মহাজন ! চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে শুরু করে কোথায় আজ ঠেকেছে কোন আঘাটায় ! কে জানত এমন হবে ! আগে আভাস পেলে নগদ আদান-প্রদান যাই হোক, কবালায় পণ লিখত তিন শো টাকার কম নয়।

উপায় নেই। যোগেশ সিঙ্গির হাত থেকে টুকরো জমি বেরিয়ে গেল অনেকগুলি। পেটের দায়ে নয়, লটকানা দোকান করতে বা মাটকোঠা তুলতে ধার নিয়েছিল এ জাতীয় সাফাই গেয়ে সে আদালতে জবাব দিলেনা। কোনো কারকে'প না করেই জমি সে ফিরিয়ে দিলে। গাং পার হয়ে কুমীরকে ওরা কলা দেখাল বলে রাগ করল না। ভগবান যদি দিন দেয় আবার আসবে। শুধু শুধু উকিলকে দিয়ে লাভ কি !

'মহাজনের মত ব্যাভার করে বলেই তো সে মহাজন।' সুখ্যাতি করে বলে পাঁচকড়ি সেখ। 'সিঙ্গি মশাই কেদের বাঁটে হরিণ মারেন না।'

আইনই বদলাচ্ছে। কিন্তু মানুষ বদলাচ্ছে কই ?

তাই জমি ফেরৎ পেয়েও কতদূর যাবে চাষাভুষোরা ? পুঁটির পরাণ কতক্ষণ ? ডুলির কড়িতে কবে একদিন বিবি বিকিয়ে দেবে।

যোগেশ সিঙ্গি ধান এবার মজুত করবে। ধার না দিয়ে তেজী বাজারে বিক্রি করবে নগদ টাকায়। তাইতেই হাঙ্গামা কম। হাতে-হাতে কারবার। রয়ে-সয়ে ব্যবস্থা। আর দাদনি-মহাজনি নয়। ঢের

শিক্ষা হয়েছে যোগেশ সিঙ্গির। বলে, শিখছ কোথা, ঠেকছ যেথা।

পাকা গাঁথনির উপর যোগেশ সিঙ্গির দু-দুটো পেল্লায় হামার। এক-এক হামারে প্রায় পাঁচ শো মণ গাদি করা। মাথার দিকে দরজা। মই না হলে নাগাল পাওয়া যায় না। দরজায় তালা মারা। যাতে ইঁদুরে না নষ্ট করতে পারে তারি জন্যে ধানের উপর ধারালো শরঘাস বিছানো।

সব থাকবে মজুত হয়ে, নিটুট হয়ে। দরের যখন তেজ হবে তখন ছাড়বে আস্তে আস্তে। তার আগে নয়।

চাষী-প্রজারা চেয়ে থাকে হামারের দিকে। চেয়ে থাকলে কী হবে, আর ধার-কর্জ নয়, কবালা-কটকবালা নয়, স্রেফ সাফ বিক্রি। জমি-টমি নয়, সিধে ধান। ঘুরিস-ফিরিস কী এদিক-ওদিক? তোদেরই ধান তোরাই খাবি। আমি শুধু তোদের জিম্মাদার। তাই বাজার বুঝে নগদ টাকা নিয়ে আয়। কর্জ নিবি তো আরেক জনের ঠেঁয়ে নে গে। জমি বেচবি তো অন্য মহাজন ধর। আমি এবার নগদ টাকার বেপারী। অনেক গপচা দিয়েছি, আর নয়।

'অবিনাশ বায়েন বড্ড কান্নাকাটি করছিল। বিচব নাকি?' বট দত্ত জিগগেস করলে।

'দর কত এখন?'

'সাত টাকা।'

'ভাদ্র আশ্বিন পড়ুক। এখুনি তড়ি-ঘড়ি কেন? ওদের যত বেশি খিদে ধরবে ততই তো দরের তেজ বাড়বে। তাই না?'

ছালা টানে, মুনিষ খাটে, কিরষ নি করে, গাড়ি বয় আর হামারের

দিকে তাকায় ওরা লম্বা চোখে। ওই হামারের মধ্যে ধান, যেমন নারীর বসনের মধ্যে যৌবন।

সবাই ওরা ঠিক করেছিল ধর্মগোলা করবে। ক্ষেতপিছু ধান ধরে, ফলন বুঝে। বাকার করে বেঁধে রাখবে ধান। অভাবের দিনে শস্তায় কর্জ পাবে সবাই, পাবে লম্বা মেয়াদ। নিজেদের ব্যাপার, তাই এতে ফিকির-ফন্দির কথা নেই। কিন্তু কেউ কাউকে বিশ্বাস করল না।

এখন ধানের জন্যে তুফানে পড়েছে সবাই।

'এবার ছাড়ব নাকি কিছু ?' বটদত্ত উসখুস করতে থাকে : 'তিন চারজন এসেছে এবার।'

'দর কত এখন ?'

'সাত টাকা ছ আনা।'

'আরো তুটো দিন যাক।'

'এর পর হলে লোক বাড়তে থাকবে। তিন-চার থেকে দশ-বারো, দশ বারো থেকে—' বটদত্ত গলা নামায়।

'যতই হোক, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, গোলা লুট করবেনা। যে ডালে বসে আছে সেই ডাল কাটবেনা কখনো। ভুখা কি তুই হাতে খায় ? বাজারে আরো টান ধরুক।'

কিন্তু এমনি সময় সরকারী রুবকারি এসে হাজির। যোগেশ সিঙ্গিকে সাতশো মণ ধান দিতে হবে। বলা নেই, কওয়া নেই, মাপ নেই, ওজন নেই, সাত শো মণ বলে দিলেই হল ? তাও নিজে গিয়ে গুদামে দিতে হবে পৌঁছিয়ে। অত ছালা-বস্তা না থাকে, নিয়ে এসো গে আগেভাগে তারপর গরুর গাড়ি জোগাড় করো। জন ধরো।

কয়েল ডাকো। সব তোমার নিজের খরচ। খরচ-খরচা সহ মণ পাবে মাত্র সাড়ে ছ টাকা।

যোগেশ সিঙ্গির মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। এখন উপায়?

উপায় তো দেখতে পাচ্ছিনে কিছু। বটদত্ত চোখ মিটির-মিটির করতে লাগল।

এসেসরবাবুকে গিয়ে ধরো। একেবারে রেহাই পাবনা জানি, কিছুটা মিনাহা করে দিক। সাতশোর জায়গায় দুশো। হিসেব করে পড়তা-মত কিছু না হয় এদিক-ওদিক—বুঝছই তো।

নাপিত ধুত্তু, শেয়ালের পুত্তু। বটদত্ত গেল এসেসরবাবুর কাছে।

এসেসরবাবু হুমকে উঠল। এ এলেকা বাড়তি এলেকা, এখানকার টার্গেট পনেরো হাজার। একদানা কারু বাদ-রেয়াৎ হবে না। এ ধান যাবে ঘাটতি অঞ্চলে। এক জায়গার ধান গুমে যাবে, আরেক জায়গার লোক হাভাত হাভাত করে ফিরবে এ অসম্ভব। আমার কাছে ছাড়ছুড় নেই।

ছোট চোখে বটদত্ত বললে, 'ধান যদি সবাই ধরে রাখে এ এলেকাও তবে তো ঘাটতি এলেকাই হয়ে গেল। এ ধানটা তাই এখানেই আমরা ধীরে-সুস্থে বিলি করে দিই না। আপনি বরং—শুনুন, এদিকে একটু আসুন।'

'বেশি তেল দেখাবেন তো পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেব। নিজের ষ্টকে না থাকে শেষকালে বাজার থেকে কিনে এনে পুরিয়ে দিতে হবে। রেট পেনাল হয়ে যাবে।'

খবর শুনে যোগেশ সিঙ্গি মরিয়া হয়ে উঠল। ডাক-হাঁক দিলে সবাইকে।

সবাই এবার এসে তোমরা ঠেকাও। যে হু-তিনজন করে একে-একে আসছিলে ধান নিতে, তারা এসে এখন একত্র হও। বলো, দেশের ধান চলে যেতে দেবোনা। মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে দেবনা আমাদের।

হাঁসের খাঁচা নেড়ে দিয়েছে। হুমাহুমি লেগে গেল। গাঁয়ের লোক সবাই খেপে উঠল। কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবনা ধান।

'ধান যদি নিয়ে যায় তো আমরা খাব কি?' পাতলা বেতের মত চেহারা হয়ে গিয়েছে, বললে লাহিরি সেখ।

'এবার আর ছাড়ছোড় নেই। এবারে ঠিক মরব। গোর-কাফিনও জুটবেনা।' বললে বরকৎ আলি। হাড়-পাঁজরা বের-করা, পরনে শুধু একটা ন্যাকড়ার ঘের।

'গেল বার তবু জমিজিরাৎ কিছু হাতে ছিল একেবারে উচ্ছন্ন হয়ে যাইনি। এবারে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হবে।' কাগাবগা চুল, লগবগ করে হাঁটে, বলে কান্তি পদ্মান।

'তারপর এবার আবাদের অবস্থা দেখেছ? শ্রাবণ মাস গেল জমিতে এখনো জল লাগল না। বীচনের পাব ছেড়ে গেল।' অরে ধোঁকা শুকনো চেহারায় বললে পাঁচকড়ি সেখ।

'ভাদ্দরে ঝরলে হু-আনা চার-আনাও পাবনা। ধান চিটনে মরিঞ্চে হয়ে যাবে। পাত উঠে যাবে গৈ-গ্রাম থেকে।' গুম-ধরা মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেললে অবিনাশ বায়েন।

'ফুটো নৌকার কালাপাতি চলবে না আর। সব্বংশে ডুবব এবার।' বললে ভুবন গাড়োয়ান।

'জমিজমা যে বেচব, টাকা দিয়ে কোন আমোদ হবে? ধান

কিনতে হবে তো? ধান-চাল কোথায়? সব দেশান্তরী।' বললে বাণেশ্বর গনাই।

না, না, নিয়ে যেতে দেবনা। কী করতে পারে যদি একজোট হয়ে দাঁড়াই সবাই? কী হবে? পুলিশ আসবে? গুলি করবে? করুক। এমনিতেও মরব অমনিতেও মরব। একশো জন মরবে, বাঁচাবে এক হাজার।

পড়শির মুখ না আরশির মুখ! সবাইর মুখে প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা। যোগেশ সিঙ্গির বুকটা ফুলে উঠল।

খোঁজ নিতে গেল পাশ-গাঁয়ের মজুতদাররা কী করেছে। মদন সরকার আর একুবালি।

মদন সরকার হাড়ে টক বদমাস, ভেবেছিল পগার ডিঙিয়ে যেতে পারবে। তার বরাদ্দ হয়েছিল পাঁচশো। আন্দাজী ওজন, এসেসরের খামখেয়াল। মদন কতক চাল করে ফেলল, কতক খড়ের গাদা খুলে লুকোল বাকার বেঁধে। মেঝে কেটে লুকোবার সময় ছিল না, উঠোন কেটে লুকোতে গেলে তো জল পড়ে গাছ গজাবে। ক্রোকী ধান ধরতে এসে হামার খুলে দেখা গেল বড় জোর পঞ্চাশ মণ। কী ব্যাপার? রুবকারি পাঠাবার সময় তো কাঁটা ধরে ওজন করে যাননি, বাইরে থেকে ঠাউকো মাপ ধরে গিয়েছিলেন। আমার আছেই মোটে ওই। যা আছে তাই নেবেন। মন-গড়া মাপ ধরলে আমরা করব কী?

সুরু হল খানা-তল্লাসী। খড়ের গাদার ভিতর থেকে ধান বেরুল। আর অন্ধকার ঘরের মধ্যে মটকিতে এসব কী? এ মশাই চাল। চাল নেবার তো হুকুম নেই। কে বললে নেই? ধানের

মধ্যেই চাল। জোরের মধ্যেই অধিকার। এ চালকেই আবার ধানে নিয়ে যাব। অধিকারকে শক্তিতে।

লাভ হল কী? নিজেও ঠকল, গ্রামবাসীদেরও ঠকাল।

আর একুবালি?

সে ছুঁদে মামলাবাজ, সে রুবকারি গ্রাহ্য করেনি। তার বরাদ্দ ছিল চারশো। শ তিনেক মণ সে চলতি-দরে বেচে দিয়েছে গাঁয়ের মধ্যে। ক্রোক করতে এসে দেখে হামার প্রায় খালি। খানাতল্লাসী করেও সুফল হল না। ধরে নিয়ে গেলে আসামী পাওয়া যায় কিন্তু বরাত্তী ধান পাওয়া যায় না। তবু পুলিশ-হায়রানিতে পড়ার মজা কি তারই ঝাঁজটা সে একটু জেনে রাখুক।

তখন করলে কী একুবালি?

সব নাম দিলে যাদের-যাদের ঘরে সে ধান বেচেছে। সরকারী দলবল পড়ল গিয়ে সে সব চাষী গেরস্তর বাড়িতে। পাকা রুবকারি দেবার সময় কোথায়? কাঁচা টোকচা শিলিপ দিলে, বললে, এত মণ তোর, এত মণ আপনার। যা কিনেছিল সাত টাকা বার আনা দরে তাই তাদের বেচতে হল ছ টাকা ছ আনায়। একুবালির বরাদ্দ মিটে গেল, পুরে গেল ঘাটতি। চারশো মণ ধরা হয়েছিল, চারশো মণেরই সে বুঝ দিলে।

'শোন, শুনে রাখ তোরা সবাই।' যোগেশ সিঙ্গি ডাক দিলে গাঁয়ের জনতাকে। 'তোরা এক্ষুনি-এক্ষুনি ধান চাস? তা হলে ঐ একুবালির খদ্দেরদের মত দশা হবে। ধানও পাবিনা উলটে লোকসানি দিবি।'

'না, এ ধান আমরা নিতে দেবনা গাঁয়ের থেকে।' বললে লাহিরি সেখ।

'হামার আমরা পাহারা দেব।' বললে কান্তি পদ্ধান।

'ঘিরে থাকব একের পর এক দেয়াল গেঁথে।' বললে বরকৎ আলি।

'দুর্গের দেয়াল।' ফোড়ন দিলে অবিনাশ বায়েন।

'দেখি কে আমাদের ধান নেয়!' বললে পাঁচকড়ি সেখ।

'পাশালি গাঁয়ের মত আমরা জবথব নই।' বললে ভুবন গাড়োয়ান।

পড়শির মুখ না আরশির মুখ! যোগেশ সিঙ্গি মনে-মনে উলসে উঠল। বটদত্তকে কাছে ডেকে বললে, 'একবার যদি ঠেকাতে পারি—'

বটদত্ত মিটির-মিটির চোখে বললে, 'একবার যদি—'

কড়ারী দিনে ধানের দর আরো খর হবে নিশ্চয়। একবার হটিয়ে দিতে পারলেই তক্ষুনি-তক্ষুনি বেচে দিয়ে ফর্সা হয়ে যাব।

হুকুমের সোহাগটা একবার দেখনা। ছালা বয়ে আনো গুদোম থেকে। নিজেই গরুর গাড়ির জোগাড় করো। নিজের খরচে মুনিষ ধরো। নিজে গিয়ে বয়ে নিয়ে বুঝ দিয়ে এসো।

কেউ আমরা মুনিষ দেবনা। কেউ আমরা কাঁটা ধরবনা। কেউ আমরা গাড়ি বইবনা। আমরা দাঁড়াব সারে-সারে, দল পাকিয়ে, বুক বেঁধে। এ আমাদের ধান। আপনারা আমাদের বাপ-মা, আমরা আপনাদের সন্তান। সব এক সংসার, এক ভাত। এ আমাদের সক্কলকার ধান। সক্কলে মিলে একে রুখব, রেখে দেব। হাঙ্গামা হয়তো হবে। আমাদের মজুত ধান আমাদেরই থাকবে।

যোগেশ সিঙ্গির মনের উল্লাস চোখে-মুখে ভেসে উঠল। গোঁফের কোণটা সে নিচের পাটির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলে।

এলো সেই কড়ারী দিন।

সকাল থেকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে গাঁয়ে। ঘুরে-ঘুরে বট দত্ত খবর নিয়ে এসেছে। লাঠি রেখেছে সবাই হাতের কাছে। কেদে-কাস্তে, কুড়ুল-কোদাল। বলে, আমাদের ধান, আমাদের মাঠ-গাঁ। কার সাধ্যি লুট করে নেয় আমরা থাকতে।

ঘি তা হলে যজ্ঞেই পড়েছে এবার!

এ গাঁয়ে লোক পাবেনা, বহিঃগ্রামী লোক নিয়ে এসেছে বুঝি এসেসর। রপ্তে-রপ্তে ধান নেবে। প্রথম ক্ষেপে দশখানা গাড়ি। সঙ্গে লাল-পাগড়ি-মাথায় দুটি মাত্র পেট-রোগা গেঁয়ো নিরীহ পুলিশ। হাতে দুটো মরচে-ধরা টিঙটিঙে বন্দুক। সঙ্গে কাঁটা, ছালা, ধামা, গাড়ি।

এই ওদের সাজপাট ? এক ঝাপটায় উড়ে যাবে ধুলোর মত।

কিন্তু আমাদের এরা সব কই ? এখনো বেরোচ্ছেনা কেন হুমহাম করে ? যোগেশ সিঙ্গির কোটাল হাঁক দিয়ে উঠল।

'এই যে বাবু আমরাই।'

কাছে এগিয়ে এসে যোগেশ সিঙ্গির চক্ষু স্থির। সত্যিই তো, গাড়ি নিয়ে এরাইতো এসেছে। বহিঃগ্রামী তো কেউ নয়। সব মুখ তার চেনা, সব্বাইর নাড়িভুঁড়ি।

'তোরা ?'

'হ্যাঁ, আমরাই।'

এসেসর হুকুম দিল—হামার ভাঙো।

বন্দুকে কিরিচ নেই, উঁচিয়ে পর্যন্ত ধরলে না সে-বন্দুক। আর, কত সহজে, ঠোকাঠুকি ধাক্কাধাক্কি না করেই হামারের দরজা ভাঙল

লাহিরি আর কান্তি। তাদের হাত-পাগুলো তেমনি লিকলিকে, কিন্তু চোখগুলো আগুনের ফুলকি।

'আমার হামার তোরা ভাঙবি?' চেঁচিয়ে উঠলো যোগেশ সিং।

'হু বাবু ভাঙব। ধম্মগোলা করতে পারিনি, কিন্তু অধম্মের গোলা ভাঙবার মত জোর পেয়েছি আজ। আয় সব এগিয়ে। হাত লাগা।'

ধামা করে তুলতে লাগল পাঁচকড়ি।

কাঁটা ধরে ওজন করতে লাগল অবিনাশ।

ছালা ভরে গাড়িতে তুলতে লাগল বরকৎ।

পাঁচন হাতে ভুবন গাড়োয়ান।

সবাই মুনিষ খাটতে এসেছে। কোথায় লড়িয়ে হয়ে আসবে, এসেছে মুটে-মজুর হয়ে। কোথায় নিজের জিনিস রেখে দেবে ধরে-বেঁধে, না, যেচে-সেধে বিলিয়ে দিতে বসেছে।

আর তাইতেই যেন তাদের ফুর্তি, তাদের জোর-জলুস।

'শেষকালে আমার গায়ে তোরা হাত দিবি? অন্যের হয়ে লুট করবি আমাকে?' যোগেশ সিঙ্গির খাড়া গোঁফ ঝুলে পড়ল হঠাৎ।

'উপায় নেই।' বললে লাহিরি সেখ। 'জল না দিলে কানের জল বেরোয় না।'

'বিপদ আপদে কত উপকার করেছি তোদের। আমি তোদের মুনিব, মহাজন—'

'আজ সে রবি ডুব দিয়েছে।' বললে কান্তি পদ্ধান। 'কখন নায়ের উপর গাড়ি, আর কখন গাড়ির উপর না।'

'কিন্তু এ ধান তো তোদের পেটে যাবে না।'

'কিন্তু একজনের পেট থেকে তো যাচ্ছে।' হেসে উঠল বরকৎ আলি।

'গুদোমে মাল পৌঁছে দিয়ে তোদের লাভ কী?' প্রায় কেঁদে উঠল যোগেশ সিং।

'তা জানিনা। শুধু ভাঙবার মহড়া দিয়ে রাখছি।' বললে অবিনাশ বায়েন।

'রপ্ত করে রাখছি হাত-হেতের।' বললে পাঁচকড়ি সেখ।

'কখন একদিন আবার সময় হলে—' ভুবন গাড়োয়ানের সঙ্গে-সঙ্গে সকলে তাকাল সেই ছুটো পেট-রোগা টিঙটিঙে সেপাইর দিকে। মনে হল তালপাতার সেপাই। বন্দুক তো নয়, তালের বাগলো।

'হাত চালা, হাত চালা।' এসেসরের ধমকে চমকে উঠল মুনিষ মজুরের দল। 'অমন ঢিমে চালে চললে মজুরি পাবিনা এক আধলাও।'

